শুক্লাভিসার

সুবোধ ঘোষ



প্রথম সংস্করণ

মূল্য দুই টাকা

বৈশাখ, ১৩৫১

পূর্ব্বাশা লিঃ পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা
হইতে সত্যপ্রসন্ন দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শুক্লাভিসার

একতীর্থা

বৈরনির্য্যাতন

নতুন শালিক

রিতা

ভাট তিলক রায়

কালাগুরু

প্রণীত

শ্রী সুবোধ ঘোষ

শুক্লাভিসার

কলের চিম্‌নি কলোনি আর চওল নিয়ে বোম্বাইয়ের দাদার। ঘাটি মজুরদের দেখলে মনে হয়, ওরা যেন একটা ছত্রভঙ্গ বিলদার পল্টনের লোক—বেঁটেখাট শক্ত কালো কাজে-ছেঁচা শরীর। ওদেরই পূর্ব্বপুরুষ একদিন মহারাজা শিবজীর সহায় থেকে রাজ্য ও রাজা ভেঙেছে গড়েছে, পেশোয়াদের মুলক্‌গিরি সার্থক করেছে। আজ আবার ওদেরই শ্রমের স্বেদ স্বাতীজলের মত বোম্বাইয়া বেণিয়াদের ভাগ্যের ঝিনুকে মুক্তা ফলিয়ে রাখছে।

ওদের মধ্যে অনেকে দেবল ত্রিপাঠীকে চেনে, মান্য করে, আর গুরুজী ব'লে ডাকে। শুধু গুরুজী বললেই ওরা সব পরিচয় বুঝে ফেলে। দেবল ত্রিপাঠীর বাড়ী যে দূর জব্বলপুরের কাছে কোন্ একটা গাঁয়ে, আর তার বাবা যে একজন সেকেলে জাগীরদার—এত সব কুলমানের খবর তারা রাখে না। ত্রিপাঠীকে আজ প্রায় আড়াই বছর ধরে তারা এই ভাবেই দেখে আসছে; মাথায় বড় বড় চুল, ঢিলে পায়জামা আর গায়ে একটা আঁটসাট চোগা। সুগঠন ফর্সা চেহারার এই নওজোয়ানকে তারা প্রায়ই ঘুরতে দেখে—হাতে একটা ঝোলা, তার মধ্যে বই কাগজপত্র ইস্তাহার ও আরও কত কী যে থাকে কে জানে! মজুর এলাকায় আজ যে এগারটা স্কুল চলছে, তা' সবই একা ত্রিপাঠীর কঠিন কায়পাত মেহন্নতের ফল। আরও কত হবে।

রাত বেরাতে হঠাৎ হয়তো নতুন মহল্লার কোন চওলের আঙিনায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে ত্রিপাঠী। এদিক্ ওদিক থেকে জোড়া জোড়া তাড়িকষা

লাল চোখের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি জ্বলতে থাকে। আচম্বিতে একটি ঘাটি যুবকের ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি পথ রুখে দাঁড়ায়, পেছন থেকে নিঃশব্দে আরও পাঁচসাত জন ঘিরে ধরে। এক আধটা লোহার ডাণ্ডাও হয়তো থাকে কারও হাতে।

ক্রুদ্ধ মূর্ত্তিটা দাঁতে দাঁত চেপে প্রশ্ন করে।—কুঠে ঘর ?

ত্রিপাঠী অলক্ষ্যে মুচ্‌কে হেসে জবাব দেয়।—হিন্দুস্তান।

সন্দেহ আরও শানিত হয়ে ওঠে। নাসিক নয়, সুরত নয়, সাতারা পুনা নয়, কাথিয়াবাড় নয়—হিন্দুস্তান ?

আবার প্রশ্ন করে।—তোমাচা নাম ?

ত্রিপাঠী উত্তর দেয়।—গুরুজী।

গুরুজী। সঙ্গে সঙ্গে সবাই মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানায়। কতদিন ধরে তারা আশাপথ চেয়ে আছে, কবে গুরুজী এই দিকে আসবে। এতদিন শুধু নামই শুনে এসেছে তারা। গুরুজী এলেই একটা স্কুল খুলে যাবে, তাছাড়া আরও কত নতুন কথা শোনাবে গুরুজী, অন্য পাড়ায় সবাই শুনেছে। সেইখানে ধূলোর ওপর বসে পড়ে সবাই। হাঁক ডাকে আরও কত লোক চলে আসে।

ত্রিপাঠীর কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। মজুরেরা নতুন কথা শোনে। গুরুজীর কথাগুলির পেছনে যেন এক সুদিনের সূর্য্য কিরণজাল গুটিয়ে স্থির হয়ে রয়েছে। গুরুজীর কথামত সাহসে ও প্রতিজ্ঞায় একবার দলবেঁধে উঠে দাঁড়ালেই যেন সেই সূর্য্য দেখা যাবে। কিন্তু সব কাজের আগে একটা স্কুল খুলে যায়। সবাই শিখবে—বাপ ছেলে নাতি কেউ বাদ যাবে না।

বরুত্রীর সঙ্গে দেবল ত্রিপাঠীর দেখা হয়েছিল আকস্মিক ভাবে। জানকী বাই ধর্ম্মশালার একটি কুঠরীর চৌকাঠের ওপর বসে একা একা কাঁদছিল বরুত্রী। একে বাংলা দেশের বিধবা, তায় বয়স অল্প, তায় বিদেশ। দেশে তিন কুলের কোন সংসারে দুটো সম্মানের ভাত কপালে জোটেনি বলেই একটা অনির্দ্দেশ্য ভরসায় ঝাঁপ দিয়ে চলে এসেছে দূর বোম্বাই সহরে—চাকরী পাবে বলে।

ত্রিপাঠীর মত চল্‌তি-হাওয়ার পন্থী যারা, ধর্ম্মশালা তাদের কাছে একটা ঝড়ের রাতের আশ্রয়। ত্রিপাঠী সেদিন ধর্ম্মশালাতেই ছিল। বরুত্রীর কাণ্ড দেখে জিজ্ঞেসা করলো।—কাঁদছেন কেন?

বরুত্রী।—চাকরী খুঁজতে এসেছিলাম, কিন্তু দেখছি চাকরী পাওয়া যাবে না।

ত্রিপাঠী হেসে ফেললো।—চাকরীর জন্য কান্না? আচ্ছা, কালই আপনাকে চাকরী জুটিয়ে দেব।

ঠিক পরের দিনই এসে ত্রিপাঠী বরুত্রীকে ধর্ম্মশালা থেকে নিয়ে গেল। শেঠ গোকুলদাস ফণ্ডের কর্ত্তাদের ধরাধরি করে প্যারেলে একটা হরিজন মেয়েদের স্কুল খোলাবার ব্যবস্থা করে ফেললো ত্রিপাঠী—এক রাত্রির মধ্যেই। বরুত্রী কাজ পেয়ে গেল—হরিজন মেয়েস্কুলের শিক্ষয়িত্রী।

ত্রিপাঠী বলে গেল।—এখন শুধু হাইজিন, সেলাই আর ড্রিল শেখাবেন। হিন্দিটা আগে ভাল করে শিখে নিন আমার কাছে, আর সামান্য একটু মারাঠি। মাত্র তিনটি মাস প্রতিদিন একঘণ্টা করে আমি আপনাকে হিন্দী শেখাবার জন্য সময় নষ্ট করবো। এর বেশী আর এক ঘণ্টাও নয়!

ত্রিপাঠীকে শেষাশেষি বরুত্রীরও গুরুজী হতে হলো। এই তিন মাসের মধ্যে বরুত্রী ত্রিপাঠীকে একরকম চিনেছে। এটা ঠিক দাদারের মজুরদের মতন করে চেনা নয়। এমন একজন স্বার্থহীন হিতব্রত কর্ম্মীর ওপর শ্রদ্ধা না এসে পারে না ; বরুত্রী ত্রিপাঠীকে শ্রদ্ধা করে। অচেনা জনতার মাঝখানে একটা দরদী হৃদয়ের সান্নিধ্য এত সুলভ হ'লে কে না অন্তরঙ্গ হতে চায় ? তাই বরুত্রী তার অন্তরের অঙ্গনে এক প্রীতমের আওন-কি-আওয়াজ যেন শুনতে পায়। একটি সুন্দর মুখের টানে তার চোখের চাহনী লজ্জায় বিপন্ন হতে থাকে। কিন্তু এই পর্য্যন্ত।

একটা পশমী কাপড়ের টুপির ওপর লাল সুতো দিয়ে জোড়া-হরিণের নক্সা তুলে রেখেছিল বরুত্রী। তিনমাসের শেষে শেষ-পড়ার দিন বরুত্রী সাহস করে ত্রিপাঠীকে উপহারটা দিয়েই ফেললো। বরুত্রীর মনে যাই থাক্, মুখে বললো—গুরুদক্ষিণা দিলাম।

কিন্তু উপহারটা শুধু মাথায় উঠেই রইল বোধ হয়। ত্রিপাঠীর মনের ভেতর পৌঁছয়নি। পৌঁছলে তার সাড়া ফুটে উঠতো নিশ্চয়—মুখের ভাবে একটু রক্তাভ বিড়ম্বনার ছায়া, একটু সলজ্জ হাসি। কিন্তু কই ? টুপিটা মাথায় দিয়ে ত্রিপাঠী শুধু বললো।—বাঃ বেশ জিনিষটি !

বিদায় নেবার সময় ত্রিপাঠী বলে গেল।—এইবার তুমি নিজেই নিজেকে ট্রেনিং দাও বরুত্রী। প্রথমে ভুলে যাও যে তুমি শুধু চাকরী করছো। যেকাজ নিলে তাকে ভালবাসতে শেখ। তাহলেই এর মধ্যে তুমি জীবন খুঁজে পাবে, নইলে চিরকাল একাজ তোমার কাছে মাত্র একটা জীবিকা হয়েই থাকবে।

ত্রিপাঠীর কথায় বরুত্রীর মেয়েলী প্রত্যয়ে হঠাৎ একটা রূঢ় আঘাত লাগে। বাঙালী মেয়ের মনের আল্পনার রং সাতশো মাইল দূরের মহাকোশলের একটি ছেলের চোখে ধরা পড়ে গেছে কত সহজে। কিন্তু কেজো জীবনে এসবের কোন প্রয়োজন নেই। তাই বোধ হয় সতর্কবাণী।

যথা নিযুক্তোঽস্মি। স্কুলটাই সর্বস্ব হয়ে উঠলো বরুত্রীর। সহরের যত অভাগার ঠাঁই থেকে কতগুলি নোংরা মহরের মেয়ে কুড়িয়ে এনে এই স্কুল গড়া হয়েছে। এদেরই লেখাপড়া শেখাতে হবে। বাঁধাকাজের একঘেয়ে রুক্ষতা, হেলাফেলা দিনযাপনের গ্লানি মুছে গেল বরুত্রীর। এক দিব্য তৃপ্তির আস্বাদে কাজের মুহূর্ত্তগুলি মিষ্টি হয়ে উঠেছে। ছোট ছোট মহরের মেয়েগুলি, এরই মধ্যে সুর মিলিয়ে জন-গণ-মন গাইতে শিখেছে। কত বাধ্য! ঠিক নিয়মমত সপ্তাহে শনি-মঙ্গল দু'দিন ফ্রকগুলি কেচে নিতে ভুল করে না। সেদিন সেই একেবারে অপোগণ্ড ভাঙ্গি মেয়েটা বরুত্রীর ধমক খেয়ে যেভাবে অভিমানে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলো, বরুত্রী আর চুপ করে থাকতে পারলো না। সান্ত্বনা দিতে গিয়ে মেয়েটাকে কোলের ওপর তুলে জড়িয়ে ধরলো। প্রসূতি মাতার পুলকের মত এক অভিনব বাৎসল্যে বরুত্রীর দেহমন শিউরে ওঠে। এক শিশু মহাজাতির স্পর্শে তার চেতনার সকল ক্ষুদ্রত্বের বদ্ধদুয়ার খুলে যায়—ঘরে যেন নতুন আলো আসে।

ত্রিপাঠীর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়। গল্পে আর কাজের কথায় দুজনের মন উৎসাহে অস্থির হতে থাকে। বরুত্রীর মনে পড়ে যায়, সেই টুপি উপহার দেবার প্রগল্‌ভতা। তার মধ্যে যেন ঘুস দেবার মত একটা দীনতা ছিল। ত্রিপাঠীকে কত সস্তা চরিত্রের লোক মনে করেছিল বরুত্রী। কী মতিচ্ছন্নতা হয়েছিল তার!

কিন্তু তবুও, আর একটু পরেই ত্রিপাঠী চলে যাবে। বড় একা ও ফাঁকা মনে হবে। বরুত্রীর সকল ভাবনা এক বিষণ্ণ তন্দ্রার মত বাকী অবসরটুকু অর্থহীন করে দেয়।

এক-একদিন ত্রিপাঠী এসে বরুত্রীকে বেড়াতে নিয়ে যায়। মহালছ্মীর তালের সারির ছায়ায় শুক্লা সন্ধ্যায় বালিয়াড়ীর ওপর দিয়ে দুজন হেঁটে ফিরতে থাকে। বরুত্রীর মনে হয়, অস্থির জীবনের নক্ষত্রলোকে মাত্র এক সঙ্কল্পের ছায়াপথে তারা দু'জনে যেন পাশাপাশি চলেছে। জাতি কুল ভাষা পরিচ্ছদ প্রদেশ—সব ভেদ যেন এখানে খারিজ হয়ে গেছে। এখানে আপনা হতেই হাতে বরমাল্য উঠে আসে। সকল কুলজী বিচার এখানে মিথ্যে হয়ে যায়।

বরুত্রী বলে।—আমাকে তোমার সঙ্গে সঙ্গে রাখ দেবল। আরও কাজ দাও আমাকে। তুমি একা কত কাজ করছো, আমি কিছুই জানতে পারি না। কিছুই বলনা আমাকে।

ত্রিপাঠী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে।—আর একটু ভেবে বলো বরুত্রী। এত তাড়াতাড়ি ওকথা বলতে নেই। ভুল হতে পারে।

বরুত্রী ত্রিপাঠীকে ভালবেসে ফেলেছে; অস্বীকার করলে মিথ্যা বলা হয়। সঙ্কল্প—এ যুগের নরনারীর মিলনে প্রণয়ে এই এক নতুন রাখী। সঙ্কল্পে যারা এক হতে পেরেছে, জীবনে তাদের এক হয়ে যেতে দোষ কি?

তবু মনে হয়, এই রাখীর সূত্রে কোথায় যেন একটু পাক আল্‌গা হয়ে রয়েছে। তাই টানে জোর হয় না। বরুত্রী বুঝতে পারে, একে ঠিক পাশাপাশি চলা বলে না। ত্রিপাঠী চলেছে আগে আগে, বরুত্রী তার

পেছনে। মাঝে বেশ খানিকটা মহত্ত্বের ব্যবধান। বড় বেশী তীক্ষ্ণ উদার উঁচু-মাথার মহত্ত্ব। তিল মাত্র হৃদয়ের তাপ নেই।

একটি বছরও পার হয়নি; পুষ্কর মিত্রকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—বরুত্রীর সঙ্গে মহরপাড়া আর ভাঙ্গিদের বস্তিতে মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়ায়। পুষ্কর বলে।—আমার বাপ বড়লোক, কিন্তু আমি ছোটলোক। আমিও আমার ভবিষ্যৎ ঠিক করে ফেলেছি বরুত্রী। আমিও একটা হরিজন স্কুল খুলবো।

পুষ্করের কথার ভঙ্গীতে একটু বেশী উচ্ছ্বাস থাকলেও, বরুত্রী ওর আন্তরিকতাটুকু সন্দেহ করে না। খুসী হয়। স্টীভেডোর মিত্র এণ্ড কোম্পানীর মালিক শ্রীকান্ত মিত্রের একমাত্র ছেলে পুষ্কর। জুহুতে এক পাহাড়ী ঢিপির ওপর পালেৎসা ঢঙে এমন একখানা বাড়ী; তবু এই প্রচণ্ড বনেদী বিত্তের ছলনা পুষ্করকে আটকে রাখতে পারেনি। সে নিজেই বলে।—এটা ঠিক জেন বরুত্রী, ঘরে বসে বাপের দৌলত ফুঁকে জীবনটা পার করে দেব, সে-পাত্র আমি নই। তার চেয়ে একবেলা দুটো বাজ্‌রার রুটি চিবিয়ে দেশের দশটি গরীবের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে থাকবো। আমি তোমারই মত সেবার ব্রতে নেমে আসতে চাই।

বরুত্রী হেসে ফেলে।—নেমে আসতে চাই? সে কি? বল, উঠে আসতে চাই।

পুষ্কর।—এরকম ব্যাকরণের ভুল ধরলেই গেছি। তোমাদের কাজ করতে গিয়ে কোথায় কবে পান থেকে চুনটি খসবে, আর তোমরা সবাই তখন……।

বরুত্রী।—তোমাদের কাজে, মানে? বল, আমাদের কাজ।

পুষ্কর মুখ কাঁচু মাচু করে বলে।—আমার ভুল হয়ে যাচ্ছে বরুত্রী, আরও হয়তো হবে। তুমি শুধরে নিও।

পুষ্করের এই ধরণের কথাতেই বেশী বিচলিত হয়ে পড়ে বরুত্রী। অবুঝ আদুরে ছেলের যেমন পাত্রাপাত্র জ্ঞান নেই; হঠাৎ বায়না ধরে বসে; পুষ্করের কথাগুলি সেই ধরণের। কথায় কথায় সে নিজেকে বরুত্রীর সদিচ্ছার ওপর সঁপে দিতে চায়। বরুত্রীর চিত্ত ঘিরে একটা যে সতর্ক বেড়ার আঁটুনি আছে, তার মধ্যেও কোথাও তুর্ব্বলতার ফাঁক আছে নিশ্চয়। নইলে পুষ্কর বরুত্রীর কাছে এতটা প্রশ্রয় কখনই পেত না।

ভোর রাত্রে উঠে এক-একদিন পুষ্কর আর বরুত্রী বস্তির পোয়াতি মেয়ে আর শিশুদের স্বাস্থ্যের রিপোর্ট নিতে বার হয়। পথে যেতে দেখা যায়, মহাজনদের দালানের অলিন্দের নীচে কয়েকটা বুড়ো-হাবড়া মুটে আর ভিখিরী ছেলেমেয়ে উবু হয়ে বসে পথের ধূলো হাতড়াচ্ছে। পোষা পায়রার উচ্ছিষ্ট ছোলার দানা খুঁজছে তারা। পুষ্করের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়। জিজ্ঞেসা করে।—তুমি কি সত্যই বিশ্বাস কর বরুত্রী, এই সব দুঃখ দূর করা সম্ভব? এ কী চারটিখানি কথা? তুচারটে স্কুল করে লেখাপড়া শেখালেই যে কী হাতীঘোড়া লাভ হবে বুঝি না।

ফেরবার পথে ট্রাম থেকে নেমে বাইকুলা পুল ছাড়িয়ে একটা মুচিদের বস্তির ভেতর ঢোকে বরুত্রী। পুষ্করের মনের প্রসন্নতার ওপর চকিতে একটা ফাঁড়া ঘনিয়ে আসে। রুমাল বার করে বার বার নাক মোছে—ফ্যাল ফ্যাল করে চারদিকে তাকায়।

বস্তি থেকে যখন তুজনে বের হয়ে আসে, তখন মাথার ওপর রোদ

চন্‌চন্ করে। পুষ্কর এইবার বরুত্রীকে অনুরোধ না করে আর পারে না।—একটা কাফেতে ঢুকে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিলে ভাল হতো না কি বরুত্রী? না হয়, সামনের ঐ হিন্দু বিশ্রান্তি গৃহেই গিয়ে বসি; একটু সামান্য সরবৎ টরবৎ……।

বরুত্রী হেসে ফেলে আর অনুযোগ করে।—ওসব বদভ্যাস ছাড় এবার।

বরুত্রীর স্কুলঘরেই সেদিন পুষ্কর বসে গল্প করছিল। ঘরে ঢুকলো ত্রিপাঠী।

—এটা আবার কে রে বাবা? পুষ্কর কথাটা উচ্চারণ করেই বরুত্রীর দিকে জিজ্ঞাসুভাবে তাকিয়ে রইল। বরুত্রীর দৃষ্টিতে ভ‍র্ৎসনার খরবিদ্যুৎ যেন পুষ্করকে সাবধান করে দিল। বাচালতা সংযত করে নিলে পুষ্কর।

ত্রিপাঠীর সঙ্গে পুষ্করের আলাপ আলোচনা হলো অনেকক্ষণ। এই প্রসঙ্গমুখর সময়টুকুর মধ্যেই বার বার পুষ্করের মনস্কতা ভেঙ্গে যাচ্ছিল। ত্রিপাঠীর সম্পর্কে বরুত্রীর আচরণ দুর্ভেদ্য হেঁয়ালির মত হতবুদ্ধি করে দিচ্ছিল তাকে। ত্রিপাঠী চলে গেলে পুষ্কর সোজাসুজি কথাটা না বলে আর পারলো না।—তুমি যে ত্রিপাঠীর কাছে কৃতজ্ঞতায় একেবারে বাঁধা পড়ে গেছ বরুত্রী। এই সামান্য চাকরীটার জন্যেই তো?

বরুত্রী।—বড় খারাপ ভাবে কথাগুলি বলছো পুষ্কর। এরকম বলো না।

পুষ্কর চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো। বরুত্রী দেখলো, পুষ্করের দুচোখের কোণ সজল হয়ে উঠেছে। মুখটা হৃতাশ্রয় মানুষের মত বেদনায় করুণ।

—এ-কী? ছি, ছি, আমাকে এভাবে বিপদে ফেল না পুষ্কর। বরুত্রী একটা অস্বস্তিতে ছটফট করে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে। পুষ্করের হাতটা ধরে জোর করে বসিয়ে দেয়। শেষে অভিভাবিকার মত স্পর্দ্ধিত শাসনের সুরে বরুত্রী যেন ধমক দিয়ে ওঠে।—এখন যেতে পাবে না। অবাধ্য হ'ও না। বসো।

পুষ্করের বুদ্ধিতে কোন্ রন্ধ্রে যেন এক শনি ঢুকেছে। কোথা থেকে এক প্রচণ্ড বাঙালিয়ানার দর্প এসে পুষ্করের মেজাজ ঝল্‌সে দিয়েছে। সে বলে।—পলিটিক্সে আর কাল্‌চারে আমি আগে বাঙালী, পরে অন্য কিছু। তুমিও তাই বরুত্রী, তবু মুখে সেটা মানতে চাও না।

কখনও বলে।—ত্রিপাঠীর মধ্যে কেমন একটা কাটখোট্টাই ভাব আছে। নয় কি বরুত্রী?

বরুত্রীর অন্তরাত্মা যেন একটা অশুচি হাতের ধাক্কা খেয়ে চম্‌কে ওঠে। পুষ্কর তবু বলে যায়।—শত হোক্, ওদের সঙ্গে শুধু কথাই বলা যায়। মেলামেশা যায় না।

পুষ্করের সর্ব্বশেষ অনুরোধ—তুমি বেঙ্গলে ফিরে চল বরুত্রী। সেখানে অজস্র হরিজন পাওয়া যাবে। আমাদের কাজের কোন অভাব হবে না।

বরুত্রীর মনের ভেতর প্রতিবাদ আর আত্মগ্লানির ঝড় উদ্বেল হয়ে উঠতে থাকে। পুষ্কর তার নিরর্গল মনের সাধ অকপট ভাবে বলে যায়। পশুপক্ষীর প্রকৃতির মত মানুষ পুষ্করের এই মন্দাহিংসা ভয়ঙ্কর কুৎসিত লাগে বরুত্রীর। বরুত্রী স্তম্ভিত হয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ পরে শুন্‌তে পায়, পুষ্কর বলেই চলেছে।—তোমার হাতেই

আমি নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। শুধু একটি প্রতিশ্রুতি দিও বরুত্রী; তোমাকে আপন করে নেবার মত যোগ্যতা যেন আমি পাই। যেদিন পাব, সেদিন তুমি দূরে সরে থাকতে পারবে না।

চম্‌কে ওঠে বরুত্রী। দুর্ব্বলতা চরম হয়ে ওঠে। পুষ্কর যেন জোর করে তার জায়গা করে নিচ্ছে। পুষ্করের আত্মনিবেদনের দুঃসাহস ঠেকিয়ে রাখার মত শক্তি কুলিয়ে উঠতে পারে না বরুত্রী। আর স্পষ্ট করে কিছু বুঝতে বাকী নেই—পুষ্কর কী চায়? পুষ্করের এই হরিজন-সেবার উৎসাহ এক কপট তপস্যা মাত্র। মনের দিক থেকে তার অনুমাত্র তাগিদ নেই—তবু ভালবাসার দায়ে আগুন ছুঁয়েছে পুষ্কর।

পুষ্করের বাঙালিয়ানা। ভূভারতের পথের ভীড় থেকে সঙ্গহারা ক'রে সে বরুত্রীকে এই নেপথ্যে নিয়ে যেতে চায়। ভীরু মাকড়সার মত পুষ্কর যেন এক কোনে জাল পেতে বসে আছে। সেখানে বরুত্রীকে একবার যদি পাওয়া যায়, অমনি তাকে আপন বৃত্তের মধ্যে লুফে নেবে পুষ্কর।

বাপের দৌলত। এই রূপোর পাহাড়ের ওপর বসে থাকলে বরুত্রী দূরেই সরে থাকবে। এমন দৌলতে কোন প্রয়োজন নেই পুষ্করের। সব বঞ্চনা নিন্দা ত্যাগ ও ক্লেশের কাঁটাভরা পথের সর্ত্ত সে মেনে নিয়েছে। সে পৌঁছতে চায় বরুত্রীর কাছে। বরুত্রীই ওর কাছে একমাত্র সত্য।

ভাবতে গিয়ে, নতুন এক প্রত্যয়ের মদিরতা বরুত্রীর সকল বিচার

আচ্ছন্ন করে ফেলে। আগে ভালবাসতে হয়—তবেই সঙ্কল্পে সমান হওয়া যায়। মিলনেই সব সহজ হয়ে যায়। ভিন্নপথের ধাঁধাঁ ঘুচে যায়। পুষ্কর তাই এগিয়ে আসছে। না এসে উপায় নেই। ভালবাসা ঠিক থাকলে, এক ব্রতে তাদের মিলতেই হবে। এ রাখীর কোন সূতো আল্‌গা রাখেনি পুষ্কর। শত কামনার গিঁট দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। আপনা থেকেই গলায় তুলে নিতে ইচ্ছে করে।

পুষ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে বরুত্রীর বড় বড় চোখ দুটী আবেশে ভাসতে থাকে। কয়েকটী মুহূর্ত্ত যেন মনের শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বরুত্রীর মাথাটা পুষ্করের কাঁধের কাছে ঝুঁকে থাকে। খোঁপা থেকে কাঁটাগুলি এক এক করে খুলে নামিয়ে রাখতে থাকে পুষ্কর। ভারনম্র তরুশাখা থেকে পুষ্কর যেন এক একটী ফুল তুলছে।

বরুত্রী হঠাৎ একটা ঠেলা দিয়ে ধড়ফড় করে ওঠে—দূরে সরে গিয়ে বসে।—অত্যাচার করোনা পুষ্কর। আজকের মত দয়া করে একটু বাইরে যাও। এখানে থেক না।

দেবল ত্রিপাঠী এসে বললো—কিছুদিনের মত বাইরে চলে যাচ্ছি বলেই দেখা করতে এলাম। একটা কথা বলি, কিছু মনে করো না। পুষ্কর মিত্র ভালোমানুষ সন্দেহ নেই, কিন্তু সে একজন এডভেঞ্চারার মাত্র। আমার ভয় হয়, তুমি ভুল করছো বরুত্রী।

বরুত্রী চুপ করে থাকে। মনে মনে বলে—হাঁ, আমার ভুল হতে পারে। কিন্তু তুমি স্বয়ং কি? শত নিরীহতায় তুমি অপরাধী। তুমি সোণার গাছ—নিষ্ফল শুচিতায় শুধু স্থির হয়ে আছো। তোমার ছায়া

হয় না। তুমি শুধু বুদ্ধিমান। তুমি হৃদয়ের দাম বুঝবে না কোনদিন। মনের প্রতিবাদ চাপতে গিয়ে বরুত্রীর দৃষ্টি আনত হয়ে আসে।

ত্রিপাঠী বললো।—ফিরে এসে হয়তো দেখবো, তোমরা দু'জনে বিবাহিত জীবনে সুখী হয়ে রয়েছ। ভালই হবে। আমারও তাই ইচ্ছে। তবে স্কুলটা যেন ঠিক থাকে বরুত্রী।

একথা বলতে ত্রিপাঠীর গলার স্বর একবার কেঁপেও উঠলো না। গুরুজীর আসনে বসে ত্রিপাঠী তাকে আজ বেশ একটু হীন করে দেখছে—স্কুলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কা করছে। যাক্, এই ভুলের আবরণ ঘুচাতে কতক্ষণ? বরুত্রী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে—ত্রিপাঠী ফিরে এসেই দেখবে স্কুলের কতটা উন্নতি হয়েছে। আরও দেখবে, এক দুর্বাধ্য এডভেঞ্চারারকে বশ করে সে কিভাবে তাকে জাতিসেবার ব্রতে দীক্ষিত করে নিয়েছে। ত্রিপাঠী বুঝবে—গুরুজীদেরও ভুল হতে পারে। আরও বুঝবে, পৃথিবীর বরুত্রীরা ভুয়ো নয়।

ত্রিপাঠীকে বিদায় দিতে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে এল বরুত্রী। সামনের গলিটা বড় অন্ধকার। একটা কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে দরজার কাছে রাখলো। ত্রিপাঠী পথে পা দিতে, বরুত্রী আঁচল সুদ্ধ হাত দুটো তুলে কপালে ঠেকালো।—নমস্তে।

স্পষ্ট উচ্চারিত হলো না। বরুত্রীর মাথাটা অলস ভাবে জোড়হাতের ওপর ঝুঁকে পড়ে রইল কিছুক্ষণ।

ত্রিপাঠী চলে গেছে। বরুত্রীর কাজের প্রেরণা তবু প্রদীপের মত

জ্বলতে থাকে। কোন ফাঁকি, কোন শৈথিল্য, কোন অবসাদ তিলেকের জন্য তাকে বিভ্রান্ত করে না।

এক নিরাতঙ্ক আনন্দে মজে ছিল পুষ্কর। মনে মনে হাঁপ ছাড়ে, বর্গীর উপদ্রব যেন শান্ত হলো এতদিনে। সারা বাংলার পৌরুষকে অপমান করার জন্যই যেন ত্রিপাঠী তৈরী হয়েছিল। একজাতি আর মহাজাতি! ওসব ফাঁকা বুলি কংগ্রেসের বৈঠকী প্রস্তাবেই ভাল শোনায়।

পুষ্কর আর বরুত্রীর বিয়ে এখনও হয়নি। যেকোন দিন হয়ে যেতে পারে। বেঙ্গল ক্লাবের গল্পগুজব ছ'মাস ধরে এই প্রসঙ্গের গন্ধে ও আমোদে ভন্‌ভন্‌ করছে।—হরিজন মেয়েস্কুলের এক বিধবা মাস্টারণীর পাল্লায় পড়েছে টাকার কুমীর শ্রীকান্ত মিত্রের একমাত্র ছেলে পুষ্কর। শ্রীকান্ত মিত্রও শক্ত লোক। স্পষ্ট ভাষায় প্রতিজ্ঞা শুনিয়ে দিয়েছেন, যদি এই বিয়ে হয়, তাহ'লে পুষ্কর মিত্রকে একটা কাণাকড়িও ছুঁতে হবে না। ফুলের টবগুলি পর্য্যন্ত দানখয়রাতের জন্য লিখে দিয়ে যাবেন।

পুষ্কর মিত্র ঘাবড়ে যাবার ছেলে নয়। সে নিজেই নিজের পথ করে নিতে জানে এবং করেও নিয়েছে। সে-কথাই জানাবার জন্য সেদিন বৈকালে স্কুল ঘরে আচম্বিতে এসে বরুত্রীর কাজে বাধা দিল।—ওসব ঠেলে সরিয়ে রাখ এখন। বাইরে ঘুরে আসি চল। অনেক কথা আছে।

বিরক্তি ও অনিচ্ছা চেপে রেখে বরুত্রীকে যেতে হলো পুষ্করের সঙ্গে। পথে তিনবার ট্রাম-বাস বদল করে মেরিন লাইন পৌঁছনো পর্য্যন্ত বরুত্রী একটা সংশয় নিয়ে পুষ্করের হাবভাব আচরণ লক্ষ্য করলো। কোথায় যেন তালভঙ্গ হয়েছে মনে হচ্ছে। অন্যদিনের তুলনায় বেশ একটু বিসদৃশ।

মেরিন লাইনের নতুন পোস্তার ওপর দুজনে পাশাপাশি বসে রইল অনেকক্ষণ। পেছনে পিচ্ছিল পিচের নদীর মত কুইন্‌স্ রোড ছাপিয়ে দলে দলে লোকে বেড়াতে আসছে। সূর্য্য ডুবছে, কাদাটে আরব সমুদ্রের জলে গুলালী আলোকের চূর্ণ ছড়িয়ে পড়ছে। এক পার্শী ঠাকুর্দা নাতি-নাতনীর সঙ্গে ভেজা বালি দিয়ে একটা নকল গেট-অব-ইণ্ডিয়া তৈরী করে হাসছে খেলছে। অন্ধকার ঘনিয়ে উঠতেই তারা চলে গেল। দূরে রাতের মালাবার হিল—আকাশ থেকে যেন একটা দীপান্বিতা মেঘপুরী সমুদ্রের জলের ওপর ঝুলছে।

পুষ্কর বললো—যে কাজটা পেয়েছি, তাতে আমিই প্রথম বাঙালী। প্রথম ইণ্ডিয়ানও বলতে পার। কোন মেড়োকে আজ পর্য্যন্ত এই পোস্ট দেওয়া হয়নি।

গায়ে আধময়লা খদ্দরের সাড়ী, পায়ে নিজের হাতে তৈরী এক জোড়া রঙীন বেতের স্যাণ্ডেল—তাও ছিঁড়ে গেছে। প্রকাণ্ড রুক্ষ খোঁপাটা ভেঙে ঘাড়ের ওপর হেলে পড়েছে। বরুত্রী নিষ্কম্প দৃষ্টি তুলে তার পাশের প্রসন্নভাগ্য এই পুরুষটীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

পুষ্কর বললো।—ভারতবর্ষে এই প্রথম একটী আসমানী ফৌজ তৈরী হলো। এক বছর প্রোবেশনার হয়ে কাজ করবো, তার পরেই অফিসার করে দেবে। যতদিন না পারমানেণ্ট হই বরুত্রী, ততদিন তোমাকে একটু ধৈর্য্য ধরে থাকতে হবে। তারপরই তোমায় এসে নিয়ে যাব।

বরুত্রীর সকল বোধ বিচার আর অনুভবের স্নায়ুজাল যেন নিদারুণ এক অর্থ-হীনতায় ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছিল।

বরুত্রী।—নিয়ে যাবে? কোথায়?

পুষ্কর।—আলমোড়া। ছোট একটা বাংলো ভাড়া করবো। সেইখানে তুমিই গিয়ে আমার সংসার সাজিয়ে বসবে।

বরুত্রীর সম্বিৎ যেন অনড় পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে যায়। পুষ্কর উৎসাহিত হয়ে বলে।—তোমার ভাগ্যের জোরেই এত ভাল কাজটা পেয়ে গেলাম। এইবার তোমার ঐ নোংরা চাকরীর দুঃখ দূর হবে। শুনে তুমি খুসী হচ্ছ না বরুত্রী?

বরুত্রী তার মাথার জ্বালা দূর করার জন্যই বোধ হয় একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালো। মনের ভেতর একটা চরম ব্যর্থতার জ্বালার হল্‌কা ছুটছিল। বরুত্রী বললো।—বুঝেছি, তুমি সেপাই হতে চলেছ। এতদিনে মনের মত আদর্শ খুঁজে পেয়েছ।

পুষ্কর।—তুমি রাগ করছো। মস্ত ভুল করছো বরুত্রী। আর দুটী মাস মাত্র এখানে আছি। আর্য্যসমাজের শাস্ত্রী মশায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বিয়ের ব্যবস্থা ঠিক করে এসেছি।

বরুত্রী ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছিল। মেরিন লাইন স্টেশনে একটা লোকাল ট্রেন আসবার সিগন্যাল পড়েছে। বরুত্রী খোঁপাটা এঁটে নিয়ে তাড়াতাড়ি পা ফেলে এগিয়ে গেল। পুষ্কর একা বসে রইল অনেকক্ষণ। কী রকম একটা বিশ্বাস ছিল, বরুত্রী একটু শান্ত হয়েই আবার ফিরে আসবে। এসেই আবার ডাকবে। এর আগে কতবার তো এমনি করে ডেকেছে।

কঠিন ধৈর্য্যে দিন গুণে গুণে দুটো মাস প্রায় শেষ হতে চললো। পুষ্কর এসে বললো।—আমার সময় হয়ে এল বরুত্রী।

বরুত্রী।—তুমি যেতে পাবে না।

পুষ্কর।—কেন ?

—তোমাকে হরিজন স্কুলে কাজ করতে হবে।

—আমি বলছি, তোমাকে স্কুল ছাড়তে হবে।

—অসম্ভব। আমার জীবনের একটা তৃপ্তি আমি মিথ্যে করে দিতে পারি না। স্কুলের মেয়েদের ছাড়া পৃথিবীর কোন আলমোড়ার বাংলো আমার ভাল লাগবে না।

—চিনতে পারলাম তোমাকে। আমি এবার বিদায় হই।

—ভুলে যাচ্ছ পুষ্কর, তোমার চলে যাবার অধিকার নেই। আমার ওপর যে নতুন একটী শিশুর প্রাণের দায় দিয়ে গেলে—সে যখন আসবে, তার ভার নেবে কে ?

—ভয় দেখিও না বরুত্রী। তুমিই তো তাকে তোমার হরিঘোষের গোয়ালের একটা পশু করে রাখতে চাও। আমি চাইছিলাম তাকে মানুষের ঘরে তুলে নিয়ে যেতে।

পুষ্কর তার সকল ব্যর্থ আগ্রহের জ্বালা সম্বরণ করে শেষে মিনতি' জানালো।—তুমি এসব ছেড়ে আমার সঙ্গে চলে এস, বোকামি করো না, বরুত্রী লক্ষ্মী……।

বরুত্রী বললো।—না, পারবো না।

পুষ্কর।—আচ্ছা, যাই।

জামিনে ছাড়া পেয়ে য়েরোড়া জেলহাজত থেকে একবার বোম্বাই আসতে হলো ত্রিপাঠীকে। স্কুর ঘরের টিনের দরজায় টোকা দিয়ে ডাকলো।—বরুত্রী !

সাড়া না পেয়ে আবার ডাকলো।—পুষ্কর বাবু।

দরজা খুলে গেল। ত্রিপাঠী হাসিখুসীর ফোয়ারার মত ঘরে ঢুকেই বরুত্রীর দিকে তাকিয়ে বললো।—কী সৌভাগ্যবতী ? কী খবর তোমাদের বল। পুষ্কর বাবু কোথায় ?

বরুত্রী।—আলমোড়া গিয়েছেন। ভাল সরকারী চাকরী পেয়েছেন।

ত্রিপাঠীর চোখে পড়লো, বরুত্রীর চোখ মুখ ফোলা ফোলা। গলার স্বর ভাঙা ভাঙা। একটা কান্নার বর্ষা যেন শরীরের ওপর দিয়ে পার হয়ে গেছে। ছেলে-মানুষের মত একটা দুরন্ত কৌতূহল আর দরদ নিয়ে ত্রিপাঠী বরুত্রীর কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো।—সব খুলে বল বরুত্রী। কিছু লুকোতে পারবে না আমার কাছে। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে।

বরুত্রী সব দ্বিধা সঙ্কোচ দূরে ঠেলে ফেলে প্রস্তুত হয়ে নেয়। আজ যেন তার মানত শেষ হবার দিন। বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সব প্রমাদ পতনের স্বীকৃতি শুনিয়ে যাবে।

কাহিনী শেষ করতে বরুত্রীর মাত্র দশটী মিনিট সময় লাগলো। ত্রিপাঠীর মুগ্ধ মুখের দীপ্তি ধীরে ধীরে রঙীন হয়ে উঠতে লাগলো।

বরুত্রী বললো।—পুষ্কর আমার মনের একটা সত্যি কথা জানতো পারলো না—তাকে আমি আজ শ্রদ্ধা করি। সে সাহসী ও শক্ত মানুষ; তার আদর্শে সে ঠিক আছে। আমিই তাকে ভুল বুঝেছিলাম।

ছোট ছোট নিরভিমান ঢেউয়ের মত বরুত্রীর কথাগুলি যেন একটী সমাপ্তির কিনারায় এসে ভেঙে পড়ছে। ত্রিপাঠী চঞ্চল হয়ে উঠলো। তাকিয়ে রইল বরুত্রীর মুখের দিকে। পাথর ছড়ানো কাজের পথে

এতদিনে যেন একটী স্ফটিক আবিষ্কার করেছে ত্রিপাঠী। দুরন্ত লোভীর মত চোখের দৃষ্টিটা চক্‌চক্ করছিল ত্রিপাঠীর।

বরুত্রী।—যাবার আগে গুরুনিন্দা আর করবো না, তাই আর একটী কথা আমার বলা হলো না। শুধু অপেক্ষায় ছিলাম, এইবার আমাকে বিদায় দেবার ব্যবস্থা করুন। স্কুলের জন্য অন্য লোক দেখুন।

ত্রিপাঠী।—কেন?

বরুত্রী।—বলেছি তো, আমার জীবনে দুর্নামের দাগ লেগেছে। স্কুলের সম্মান আগে বাঁচাতে হবে।

ত্রিপাঠী—হাঁ, বাঁচাতে হবে। আমি আর তুমি দু'জনে মিলে বাঁচাবো।

বরুত্রী।—দু'জনে মিলে?

ত্রিপাঠী।—হ্যাঁ গো সাহেবা। আমি মহাপুরুষ নই। আমি কাজের মানুষ। দু'জনে মিলে কাজ করতে জানি।

উতলা আকাঙ্ক্ষার দুটি পুরুষবাহু বরুত্রীকে চকিতে বুকের ওপর টেনে নিয়ে সাপটে ধরলো। বরুত্রী যেন আনন্দে ফুঁপিয়ে উঠলো।—এ কী করছো, দেবল?

ত্রিপাঠী।—তোমাদের দু'জনকে চুমো খাচ্ছি।

হেঁয়ালির মত শোনালো। বরুত্রী জিজ্ঞেসা করলো।—দু'জনকে? তার মানে? শীগ্‌গির বল দেবল; আমার ভয় করছে।

ত্রিপাঠী।—হাঁ, দুজনকে, তোমাকে আর······

বরুত্রী।—আর কাকে?

ত্রিপাঠী।—আমার ছেলেকে।

একতীর্থা

শনিবার দিনটা বীণা দিদিমণির কাছে ব্রত-পার্বনের মত। তেমনি আয়োজন উৎসাহ আর নিষ্ঠা—আনন্দের প্রসাদও কিছু কম নয়। বেলা দেড়টার সময় স্কুলের ছুটী হবে। সোজা গিয়ে হোষ্টেলে তাঁর সাজানো ঘরটীতে ঢুকবেন। একখানা দুধে গরদের সাড়ী পরবেন। নরম দেখে একটা ক্যাম্বিসের জুতো পায়ে দেবেন। কোন প্রয়োজন নেই, তবু ছাতাটা নিতে ভুলবেন না। নিকেলের ফ্রেমের চশমাটা পরা চাই-ই—সেটার প্রয়োজন আছে। তারপর বের হবেন। প্রথমে গৌরীদের বাড়ী, তারপর লীলাদের বাড়ী—সেখান থেকে পর পর শান্তি আর অর্চনাদের বাড়ী। চারটী মেয়েই তাঁর ছাত্রী। শনিবার দিন সিনেমাতে গিয়ে একটা ছবি দেখতেই হবে—না দেখলে চলে না। সে ছবি বাংলাই হোক, আর ইংরাজীই হোক্—হিন্দী হলেই বা আপত্তির কি আছে? একা ছবি দেখে সুখ হয় না বীণা দিদিমণির। শিষ্যা কয়টী সঙ্গে থাকে।

বুড়ো মানুষ বীণা দিদিমণি—বিধবা ও নিঃসন্তান। স্কুলটাতেই ত্রিশটী বছর পার করে দিলেন। স্কুলবাড়ীটা যখন একটা আটচালা ছিল মাত্র আর ছাত্রী ছিল ষোলটী—তখন থেকেই তিনি আছেন। এখন না হয় এত বড় একটা দালানবাড়ী হয়েছে—ডবল এম-এ মিস্ নিয়োগী হেড মিষ্ট্রেস রয়েছেন। আরও তেরটী টীচার আছেন।

হোষ্টেলের সবচেয়ে ভাল ঘরটী বেছে নিয়েছেন বীণা দিদিমণি। মিস্ নিয়োগী যেটায় থাকেন—সেটা আরও ছোট ও দেখতে খারাপ।

যেদিন ইনস্পেক্ট্রেস্ আসবার কথা থাকে—সেদিন সকাল থেকে টীচারদের মধ্যে সাড়া আর কাজের তাড়া লেগে যায়। বীণা দিদিমণি সেদিনও নিশ্চিন্ত মনে, নিরুদ্বেগ প্রশান্তির সঙ্গে সাড়ে দশটার সময় স্নানাহার সেরে বিছানার ওপর আর একবার গড়িয়ে পড়েন। মিস্ নিয়োগী খবর পেয়ে বিরক্ত হয়ে বীণা দিদিমণির ঘরে এসে ঢোকেন!
—এ কী? দিব্যি শুয়ে পড়ে আছেন? উঠুন এখন, ক্লাসে গিয়ে বসুন।

বীণা দিদিমণি মিস্ নিয়োগীর দিকে একবার তাকিয়ে গা-মোড়া দিয়ে পাশ ফেরেন। হাত তুলে তাকের ওপরে হাতপাখাটা দেখিয়ে দেন। বলেন—ঘাড়ের কাছটায় এইখানে একটু বাতাস কর্তো ভুতি।

মিস্ নিয়োগীর সঙ্কট আর বিরক্তি চরম হয়ে ওঠে। পাখাটা নিয়ে উগ্র উৎসাহে ঝট্পট্ কিছুক্ষণ বাতাস করেন। তারপরেই ব্যস্ত দ্রুত চলে যান—এগারটা বাজে প্রায়, ইনস্পেক্ট্রেস আসতে আর দেরী নেই।

বীণা দিদিমণির ছেলেবেলার বন্ধুর নাম গীতা। গীতা আজ দশ বছর হলো মারা গিয়েছে। গীতার স্বামী মিষ্টার নিয়োগী মারা গেছেন পনের বছর আগে। সেই গীতার মেয়েই হলো মিস্ নিয়োগী। বীণা দিদিমণি আজও তাঁকে ভুতি বলেই জানেন। ভুতিকে তিনি এতটুকু দেখেছেন। সেই মেয়েই আজ হেড মিষ্ট্রেস হয়েছে। তাতে হয়েছে কি?

বীণা দিদিমণি বেশ আছেন। সিনেমাতে ছবি দেখার বাতিকটা তাঁর নতুন। হাউসটাই তো বছর পাঁচেক হলো হয়েছে। এর আগে গ্রামোফোনের রেকর্ড শোনার সখ ছিল বীণা দিদিমণির। তার আগে

পড়তেন উপন্যাস। তারও আগে শুধু চিঠি লিখতেন—চেনা, আধ-চেনা, একেবারে অচেনা—কোন একটা সম্পর্ক আর প্রসঙ্গ পেলেই তাদের চিঠি লিখতেন। সংসারে আপন বলতে কেউ ছিল না, তাই চিঠির জাল ছড়িয়ে বিরাট একটা আপনত্বের সংসার ছেঁকে ধরেছিলেন। দিস্তা দিস্তা কাগজ আর ডজন ডজন টিকিট উজাড় করে সেই চিঠির পৃথিবীকে ধরে রাখলেন প্রায় দশটা বছর। লিখতেন—ডিহীরীতে সুখময়বাবুকে, কোন্নগরে সাবিত্রীকে, রহমতগঞ্জে গীতাকে···আরও কত কাকে কে জানে? ট্রেনে যেতে আলাপ হয়েছিল এক নবদম্পতীর সঙ্গে—মীরাটের ডাক্তার শচীন রায় ও তাঁর স্ত্রী চপলা। জীবনে দ্বিতীয়বার আর এঁদের সঙ্গে বীণা দিদিমণির দেখা হয়নি—তবু তিনটী বছর ধরে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত চিঠির বন্ধনে অন্তরঙ্গ করে রাখলেন তাঁদের। চপলার ছেলের অন্নপ্রাশন পর্য্যন্ত খবর পেয়েছিলেন—তারপর আর কিছু জানেন না।

তারও আগে শুধু ব্রত করার বাতিকে পেয়েছিল বীণা দিদিমণিকে। এই সব পুরণো ইতিহাসের ঘটনা বলতে গেলে প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা এসে পড়ে। তখন সবে একটি বছর মাত্র হয়েছে—স্বামী হারিয়েছেন বীণা দিদিমণি।

এখন বীণা দিদিমণির শরীর অশক্ত, স্কুলের কাজে ক্রুটা হয়। এর জন্য তাঁকে কিছু বলে লাভ নেই। বেশী কিছু বলতে গেলে চরম জবাব শুনিয়ে দেবেন—আমার স্কুলের ভাল মন্দ আমি বুঝবো।

স্কুলটা যে তাঁর নয়, কোন কালেই ছিল না—এই সত্যটা তাঁকে বুঝিয়ে বলবে কে?

বীণা দিদিমণির কাছে ছাত্রীরা বড় কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে গৌরী লীলা শান্তি আর অর্চনা। স্কুলের মধ্যে বড় মেয়ে বলতে এরাই চারজন।

গৌরীর পিউরিটান দাদা সিনেমা দেখা পছন্দ করে না। লীলার মেজ কাকা কৃপণ মানুষ—সিনেমায় অযথা পয়সার অপব্যয় সইতে পারেন না। শান্তির বাবা সব সময় কাজে ব্যস্ত—একটুও সময় নেই যে মেয়েদের ছবি দেখাতে নিয়ে যান—ইচ্ছে থাকলেও। অর্চনার বাড়ীতে পুরুষ অভিভাবক কেউ নেই। ওরা মায়ে-ঝিয়ে দুজনেই বিধবা। অর্চনার মা জপ তপ নিয়েই আছেন। স্কুল ছাড়া অর্চনাও বাকী সময়টুকু এমব্রয়ডারীর কাজ নিয়ে বসে। সেটাও একরকম জপের মত ব্যাপার। তের বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল অর্চনার, সাড়ে তের বছরে বয়সে বিধবা হয়েছে। মায়ের প্রেরণায় সত্যি করে জপ তপ ধরবে ধরবে—এইরকম একটা দ্বিধা আর আগ্রহের সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছে গেছে অর্চনা।

এই সব বিপত্তিকে ঠেকিয়ে রেখেছেন বীণা দিদিমণি। চারটী শিষ্যার সিনেমা দেখার সব দায় তিনি নিজেই বরণ করে নিয়েছেন। টিকিট কেনার খরচ তিনিই বহন করেন। ছাত্রীদের বাড়ী থেকে নিয়ে যান, বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসেন। স্বয়ং উপস্থিত থেকে সাজ সজ্জার নির্দেশ দেন। বীণা দিদিমণির পছন্দ না হলে সাড়ী বদলাতে হয়। গৌরীকে লালরঙা সাড়ী কিছুতেই পরতে দেন না। শান্তিকে সিল্ক পরতে দেন না।

কোন অভিভাবকের কোন আপত্তি টিকতে পারে না। বীণা

দিদিমণি চার বাড়ী ঘুরে চারটী শিষ্যা নিয়ে সগর্বে ও সহর্ষে সিনেমা-যাত্রায় বার হন। বীণা দিদিমণির এই এক বাতিক। এই বয়সে মানুষে তীর্থ-যাত্রা করে।

রাত্রি নটার পর কিরণবাবুদের বাগানের পাশ দিয়ে একটা জ্বলন্ত টর্চ হেলেদুলে চলে যায়। সবাই বুঝতে পারে, বীণা দিদিমণি তাঁর শনিবারের তীর্থ সেরে হোষ্টেলে ফিরছেন। বুড়ো মানুষ—একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটেন।

হাউস ভরা দর্শক ও দর্শকা। তারই একটী অংশে বীণা দিদিমণি—দুপাশে চারটী শিষ্যা। জনতার মাঝখানে যেন নিজের একটী দরবার তৈরী করে সর্বেশ্বরীর মত বসে থাকেন বীণা দিদিমণি। পেটমোটা মনিব্যাগটা দিদিমণির কোলের উপরেই পড়ে থাকে। গৌরী লীলা শান্তি আর অর্চনার যত রকম দুর্বুদ্ধির খোরাক যোগাতে ব্যাগটা ক্রমে ক্রমে চুপসে আসে। চার প্যাকেট বাদাম খাওয়া শেষ হতে না হতেই শান্তি তেষ্টায় ছটফট করে ওঠে। লেমনেড আসে। অর্চনা দু'বার হাঁচে—এক কাপ চা আসে। তারপর আরও তিন কাপ।

বীণা দিদিমণি বলেন।—কী আরম্ভ করলে তোমরা? খাবে না ছবি দেখবে?

ছবি আরম্ভ হবার আগেই বীণা দিদিমণি বলেন।—চশ্‌মাটা একটু মুছে দাও তো শান্তি।

শান্তি বীণা দিদিমণির নাক থেকে তখুনি চশমাটা তুলে নেয়। গৌরী মুখের ভাপ দিয়ে চশ্‌মার কাঁচ দুটো বাষ্পধৌত করে। লীলা

আঁচল দিয়ে ঘসে ঝক্‌ঝক্‌ করে দেয়। অর্চনা চশমাটা আবার দিদিমণির নাকের উপর বসিয়ে দেয়।

ছবি আরম্ভ হয়ে যায়। ঐ নগণ্য একটা সাদা পর্দার ওপর মুহূর্তের মধ্যে কী বিচিত্র এক আলোক-কণিকার উৎসব জেগে ওঠে। শব্দে রূপে ও গতিতে মূর্ত কোন এক অদৃশ্য গ্রহবিচ্ছুরিত সুখ-দুঃখ বিরহ-মিলন ও পতন-অভ্যুদয়ের কাহিনী নৃত্য করতে থাকে। অলীক বাস্তব হয়ে যায়।

"দেবদাসী অম্বালিকার গোপন প্রেমের কীর্তি ধরা পড়ে গেছে। মন্দিরের গায়ে মূর্তি উৎকীর্ণ করতো তরুণ একটী ভাস্কর—মাধব তার নাম। অম্বালিকার জীবনযৌবন মাধবের প্রেমে বাঁধা পড়ে গেছে। মন্দিরাধীশ শ্রীধর ভট্টেশ্বর অপমানে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। কত নিশীথে মণিমাণিক্যের ডালা নিয়ে এই অম্বালিকার অনুরাগ ক্রয় করার চেষ্টা করেছেন। সবই ব্যর্থ হয়ে গেছে। দেবদাসীর সেই ঔদ্ধত্যকে ক্ষমা করতে পারেন না তিনি। তাই শাস্তির আয়োজন হয়েছে। মন্দিরের গোপন একটী প্রকোষ্ঠে শতাধিক লম্পটের এক আসরে অম্বালিকাকে নাচতে হবে—বিবসনা হয়ে।

অম্বালিকার মুখে উগ্ররকমের একটা শ্রী ফুটে উঠেছে। বিভোর হয়ে নেচে চলেছে। নাচতে নাচতে আজ যেন সে ফুরিয়ে যাবে। নেচে নেচেই বোধ হয় আত্মহত্যা করবে অম্বালিকা। নুপূরগুলি ছিঁড়ে ছিট্‌কে পড়ছে চারিদিকে।

অম্বালিকা হঠাৎ এক হিংস্র আক্রোশে থাবা দিয়ে তার বুকের নিচোল খিম্‌চে ধরলো—আর এক হাতে নীবিবন্ধ। একটী নিষ্ঠুর টানে অম্বালিকা এখনি ছিন্নভিন্ন করে দেবে সেই লজ্জার শেষ আবরণটুকু।"

বীণা দিদিমণির তন্ময়তা সতর্ক হয়ে উঠলো। দুপাশে শিষ্যাদের দিকে একবার তাকালেন। স্থির নক্ষত্রের মত সবারই চোখে কৌতুহল ফুটে রয়েছে। সিনেমার পর্দায় কাহিনীর সেই প্রচণ্ড পরিণামকে বরণ করার জন্য যেন সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে।

বীণা দিদিমণির সুগম্ভীর আদেশ বেজে উঠলো।—গৌরী লীলা, চোখ নামাও। শান্তি অর্চনা, চোখ নামাও। আবার যখন বলবো, তখন দেখবে। চোখ নামাও সবাই।

দুপাশে সুবাধ্যা শিষ্যা চারটী পর্দা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মেজের দিকে তাকিয়ে রইল। চারটী অবনত মুখ মিচ্‌কে মিচ্‌কে হাসছিল। শান্তি একবার খুব সাবধানে ঘাড়টা বেঁকিয়ে বীণা দিদিমণির দিকে তাকাবার চেষ্টা করলো। দিদিমণি আস্তে গর্জন করে উঠলেন।—কী হচ্ছে অবাধ্য মেয়ে?

মাত্র পাঁচটী মিনিট এই অধোবদন দশা। দিদিমণি বললেন।—হ্যাঁ, এইবার দেখ।

গৌরী বললো।—আর দেখে কী হবে? মাঝখানে এরকম ভাবে বাদ পড়ে গেলে গল্পটা কী আর বুঝবো?

দিদিমণি।—খুব বুঝবে, এমন কিছু ঘটেনি। মাধব হঠাৎ পৌঁছে গিয়ে অম্বালিকার মান বাঁচাবার জন্যে ওড়নার মত একটা কাপড় দিয়ে অম্বালিকাকে ঢেকে দিল। অম্বালিকা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। দুটো প্রহরী এসে মাধবকে বন্দী করলো। মাধবেরই বিচার আরম্ভ হয়েছে—দেখ সবাই। দেখে যাও, গোল করো না।

গৌরী আর লীলা—তুজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। তুজনেই শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে। বীণা দিদিমণির সিনেমাসঙ্গিনী মাত্র তুটী—শান্তি আর অর্চনা।

দিদিমণি মাঝে মাঝে বলেন।—গৌরী আর লীলা আবার আসবেই তো; কিন্তু কে জানে কবে? আবার ফূর্তি হবে একসঙ্গে, কী বল শান্তি?

শান্তি আর অর্চনা একসঙ্গে উত্তর দেয়—হ্যাঁ, দিদিমণি!

কিছুদিন পরেই শনিবারের সিনেমাব্রত আবার আগের মত ফূর্তিতে প্রবল হয়ে উঠলো। বীণা দিদিমণি খবর পেয়েছেন—গৌরী আর লীলা শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে। দিদিমণি তুপুর থেকেই এসে ভিড়লেন। দেখলেন, গৌরীর চেহারাটা গিন্নীগোছের হয়ে গেছে। লীলা আরও সুন্দর হয়েছে।

গৌরীর সামনে দাঁড়িয়ে একেবারে স্পষ্ট ক্ষমাহীন নির্দেশের সুরে, বীণা দিদিমণি বললেন।—নাও, আর দেরী করো না। বাক্স খোল। বরের চিঠি দাও।

গৌরী বার বার করুণভাবে অনুনয় করলো।—এর পরের চিঠিটা আসুক, নিশ্চয় দেখাবো দিদিমণি।

অবিচল দিদিমণি বললেন—না, আজ যেটা এসেছে, আমি সেটাই পড়বো।

লীলার অদৃষ্টেও তাই ছিল। লীলা প্রায় কেঁদে ফেললো। খুড়িমা লীলাকে ধমক দিয়ে বললেন।—কী হয়েছে তাতে? বুড়ো মানুষ, এত ভালবাসে বলেই দেখতে চাইছেন চিঠিটা। কোন দোষ নেই তাতে।

খুড়িমা হাসি চেপে অন্ত ঘরে চলে গেলেন। বীণা দিদিমণি আদ্যোপান্ত চিঠি পড়লেন। ফিরিয়ে দিয়ে বললেন।—বড় খুসী হলাম। বেশ ভাব হয়েছে দুজনে, এই ত চাই।

আবার চারিটি শিষ্যা নিয়ে বহুদিন পরে সিনেমায় ছবি দেখতে বসলেন বীণা দিদিমণি।

"তপন নামে সুশ্রী সুন্দর ভদ্রলোকের ছেলেটী মিথ্যা দুর্নামের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে সত্যি সত্যিই একটি পাপের ঘরে ঢুকেছে। যাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো, স্নিগ্ধা নামে সেই মেয়েটীও এই মিথ্যা দুর্নামকে বিশ্বাস করে ভালবাসা ভেঙে দিয়েছে। তাই মতি বাইজীর ঘরে মদের পেয়ালায় চুমুকে চুমুকে উৎসব রাত্রি প্রমত্ত হয়ে উঠছে। মতি বাইজী এগিয়ে এসে বসেছে তপনের কাছে! তার হাতে একটি গেলাস—সফেন রঙীন মদ টলমল করছে। আর একটি হাত লালসার আমন্ত্রণ নিয়ে ধীরে ধীরে আগ্রহে ফণিনীর মত এগিয়ে আসছে, তপনের গলা জড়িয়ে ধরবে—বুকের কাছে টেনে আনবে।"

বীণা দিদিমণি উসখুস করে উঠলেন। কিন্তু শিষ্যা চারজন ততক্ষণে চোখ নামিয়ে ফেলেছে।

দিদিমণি বললেন।—উহুঁ, গৌরী, লীলা, তোমরা দেখ। চোখ নামাতে হবে না। শান্তি, অর্চনা, চোখ নামাও। যখন বলবো, তখন আবার…।

গৌরী আর লীলা হাসতে হাসতে আবার ছবি দেখতে লাগলো। আড়চোখে শান্তি আর অর্চনাকে একবার দেখে নিল। করুণা হলো।

নতমুখী শান্তি গৌরীকে চিমটি কেটে ফিস্‌ফিস্ করে শুনিয়ে দিল।—হাসতে হবে না তোমাদের। সবে পরশু তো বিয়ে হয়েছে—এরই মধ্যে লাইসেন্স পেয়ে গেছ। দিদিমণির বিচারটা দেখলে অর্চনা?

অর্চনা বললো।—দিদিমণি সুবিচারই করেছেন। তুমি মিছে ওদের হিংসে করছো।

শান্তিকে আর বেশীদিন হিংসে পুষে রাখতে হয়নি। অঘ্রাণেই বিয়ে হয়ে গেল। একমাস শ্বশুরবাড়ীতে থেকে চলে এল।

বীণা দিদিমণির তদন্ত আর চিঠি-তল্লাসী বাদ পড়লো না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব না শুনে ছাড়লেন না। ঘরভরা লোকের সামনে শান্তিকে আচ্ছা করে ধমক দিয়ে নাজেহাল করলেন দিদিমণি। —এরই মধ্যে বরের সঙ্গে একবার ঝগড়াও করেছ গবেট মেয়ে! খবরদার, ওসব যেন আর হয় না। দুটীতে খুব মিলে মিশে থাকবে।

সিনেমার আসরে আবার বহুদিন পরে চারটী সঙ্গিনী পেয়েছেন দিদিমণি। দিদিমণির উৎসাহের স্রোতে যেন নতুন জোয়ারের আনন্দ লেগেছে। সেদিন ইংরিজী ছবি হচ্ছে।

"স্কটল্যাণ্ডের একটি নদীর উজান ধরে একটা জেলের নৌকা চলেছে। তখন সবে রাত্রি ভোর হয়েছে, দেখা গেল দূরে স্রোতের জলে এক রূপসীর তরুণীর দেহ ভেসে চলেছে। এক কিশোর জেলে প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে চললো, রূপসীকে ধরলো। খরস্রোতে দু'জনেই ভেসে উধাও হলো। বিকেল হয়ে গেল। নিরালা একটী পাথুরে চড়ায় সেই তরুণ-তরুণীর আলিঙ্গনাবদ্ধ দেহ ভেসে এসে

ঠেক্‌লো। তরুণী সংজ্ঞাহীন। নিৰ্জন পাথুরে চড়ায় বৈকালী রোদের মিষ্টি আলোকের খেলা, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী কলরব করে। এক জলপাই গাছের নীচে রূপসীকে কোলে করে বসে আছে তরুণ জেলেটা। মুগ্ধ হয়ে রূপসীর দিকে তাকিয়ে আছে। একবার হাত দিয়ে রূপসীর কপাল থেকে একগুচ্ছ ভেজা সোণালী চুল সরিয়ে দিল। তরুণ জেলের ঠোঁট দুটা তৃষ্ণার্তের মত কাঁপছে। মূর্ছিতা রূপসীর অসহায় অধরের দিকে লুব্ধ মধুপের মত এগিয়ে আসছে।"

বীণা দিদিমণি হাঁক দিলেন।—চোখ নামাও।

গৌরী আর লীলার লাইসেন্স আছে, চোখ নামাতে হয় না। শান্তি ও অভ্যাসবশে চোখ নামাতে যাচ্ছিল, দিদিমণি বাধা দিয়ে বললেন।—তুমি দেখে যাও শান্তি। অর্চনা, তুমি ভুল করো না কিন্তু। চোখ নামিয়ে রাখ।

শুধু অৰ্চনা। আর বাকী কেউ নেই, সবাই ছাড়পত্র পেয়ে গেছে। শুধু অর্চনা মাথা নীচু করে স্থির হয়ে বসে রইল।

গৌরী লীলা আর শান্তির ছবি দেখার আনন্দটুকু আর তেমন করে জমলো না; ক্ষণে ক্ষণে ওরা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। হেঁটমুখী অর্চনার দিকে বার বার তাকাচ্ছিল।

অনেকক্ষণ পরে দিদিমণি অল-ক্লীয়ার ধ্বনি ছাড়লেন।—এইবার তুমি দেখতে পার অর্চনা।

অর্চনা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। শান্তি একটা ঠেলা দিতেই ধড়ফড় করে উঠে বসলো।

গৌরী লীলা শান্তি—সবাই শ্বশুরবাড়ী। বীণা দিদিমণি মাত্র একটী

শিষ্যা নিয়ে সিনেমায় ছবি দেখছেন। আগের দিনের সেই জমাট ফুর্তি আজ বড় ফিকে হয়ে গেছে।

ছবি আরম্ভ হতে দেরী আছে। দিদিমণি বললেন।—চা খাবে তো, এক কাপ খেয়ে নাও অর্চনা।

একটু বিমর্ষ ভাবেই দিদিমণি আবার বললেন।—ওরা সবাই না এলে আর তেমন ফুর্তি হবে না। কী বল অর্চনা?

অর্চনা।—হ্যাঁ দিদিমণি।

দিদিমণি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।—শ্বশুরবাড়ী থেকে যা তাগাদা, না যেয়ে আর উপায় কি? বরমশাইরাও অভিমানে অধীর হয়ে উঠেছেন, দুটোদিনও মেয়েগুলোকে টিকতে দিলে না। আর কখনো একসঙ্গে ছবি দেখা হবে কি না, তাই বা কে জানে?

অর্চনা।—আমার সে-ভয় নেই দিদিমণি। আমি বেশ আছি।

দিদিমণি হঠাৎ বুঝতে না পেরে অর্চনার দিকে তাকালেন। ধীরে ধীরে একটা মূঢ়তার সুপ্তি ভেঙে যেন চম্‌কে উঠলেন দিদিমণি।

তাইতো, অর্চনা বেশ আছে। অর্চনাই শেষ পর্যন্ত ঠিক থেকে যাবে— তাঁর শনিবারের সিনেমাযাত্রার পথে একমাত্র সহচরী। কোথাও থেকে ওর আর ডাক আসবার আশা নেই। তের বছরে বিয়ে, সাড়ে-তের বছরে বিধবা। আজ উনিশ পার হয়ে কপালের ওপর ভুরু দুটো কালো প্রজাপতির মত ডানা মেলে ঘুমিয়ে পড়ে আছে। পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়, এমব্রয়ডারী করে, জপতপ ধরতে আর কত দেরী?

বীণা দিদিমণি গুম হয়ে বসে রইলেন। ছবি আরম্ভ হয়ে গেছে।—

"এক কুলবতী সধবা নারী, মাধবী তার নাম, যেমন সুন্দর তেমনি

উচ্ছল যৌবনে তার বরাঙ্গ আকুল। নিদারুণ এক ঘটনার ছায়া ওর ভাগ্য গ্রাস করতে বসেছে। পালঙ্কের উপর ব্যাধিজীর্ণ কঙ্কালসার তার স্বামী মৃত্যুর পদধ্বনি শুনছে। সেই রূপ স্বাস্থ্য আর মেধার আধার স্বামিটী আজ রোগে কুৎসিত, ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হতে চলেছে। জল তেষ্টা পেয়েছে। তাই ক্ষীণ স্বরে স্বামিটী ডাকছে।—মাধবী, মাধু, মধুমণি—

পাশের ঘরেই এক যুবক সন্ন্যাসীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে মাধবী। থেকে থেকে এক গোপন দক্ষিণ সমীরের স্পর্শ ওর অলস শরীরকে দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। মাধবী হাসছে। মাধবীকে জড়িয়ে ধরার জন্যে সন্ন্যাসী দুটি ব্যগ্র বাহু বাড়িয়ে………।”

বীণা দিদিমণি একটু নড়ে বসলেন। অর্চনার দিকে তাকালেন। অর্চনা নিমেষের মধ্যে চোখ নামিয়ে ফেললো।

দিদিমণি আর একবার ছটফট করে উঠলেন। তারপর আস্তে আস্তে ডাকলেন।—অর্চনা? শুনছো? চোখ নামাতে হবে না। মাথা ওঠাও। ছবি দেখ।

বৈরনির্য্যাতন

তখন চুংকিংয়ের তাঁতীরা নিশ্চিন্তমনে রেশমী চাদর বুনছে। মাদ্রিদের অপেরা ঘরে বেহালার সুরের খেলা নিরুদ্বিগ্ন নাগরিকের দিনের ছুটি মধুর করে তুলছে। আকাশে উঠে মাটীর মানুষের মাথায় বোমা ফাটাবার খেলাটা তখনো পৃথিবীতে এত ভালভাবে জমে ওঠেনি। নরহত্যার শিল্পে এই নতুন পদ্ধতিতে হাত পাকাবার কাজটা মাত্র তখন চলেছে, যে-দেশের কাঁচা মাথার ওপর, যেখানে এবং যেসময়ে—সেই সময়।

সেই সময়, বেস কম্যাণ্ডারকে স্যালুট জানিয়ে ফার্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ফ্লাইং কোরের একটী স্কোয়াড্রন উড়লো আকাশে! নীচে ভোরের পেশোয়ার কুয়াশার বোরখায় মুখ লুকিয়ে পড়ে রইল চুপ করে। এই শ্বেতাঙ্গ বিমানবিহারীদের মধ্যে মাত্র একটী কৃষ্ণের জীব রয়েছে—অফিসার দিলীপ দত্ত।

ভারতভূমির উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ওপারে আজাদ এলাকা। সভ্যশাসনের শান্তিকে অপমান করবার স্পর্দ্ধায় দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে কতগুলি রাষ্ট্রহীন যূথচারী মানুষ। তাদের দুর্বৃত্তি সীমা ছাড়িয়ে উঠেছে। খাড়া পাহাড়, সরু নালা আর চোরাপথের গোলকধাঁধাঁর মত এই দেশ। কাদার কেল্লার গর্বেই লোকগুলির আত্মহারা। চুক্তির সম্মান জানে না। সরহদ্ মানে না, মজুরী নিয়ে খাটতে জানে না। বন্দুক বগলে, কার্তুজ দাঁতে কাম্‌ড়ে—পাহাড়ের মাথায় পাথরের মত নিঃশব্দে মিশে থাকে। ক্রোশের পর ক্রোশ ছাড়িয়ে ওদের চোখের দৃষ্টি যেন ইংরিজী সড়কের

ধূলো শুঁকতে থাকে। সড়ক দিয়ে একটা সদাগরের কাফিলা পার হয়। আচম্বিতে নেকড়ের দলের মত হানা দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে।

• ডেরা ইস্মাসিনের নাম-করা মহাজন তিলক সাহু আজও বুক চাপ্ড়ে বেড়ান। বিয়ের আসর থেকেই তাঁর ছেলে আর ছেলের বউকে ধরে নিয়ে গেছে। তিলক সাহু আপ্শোষ করেন—ছেলের কানে এক জোড়া হীরের মাকৃড়ি ছিল। সেটাই ভুল হয়েছে, নইলে রক্ষা পেত ছেলেটা। আর মেয়েটা—সেসব মেয়ের বাবা রাজারামের ভাবনা। সে ইচ্ছে করলেই মেয়েকে ছাড়িয়ে আনতে পারে; ওর টাকার ভাবনা নেই।

ছেলের মায়ের কান্নাকাটি আর চীৎকারেই তিলক সাহু ব্যতিব্যস্ত। জীবনব্যাপী মহাজনী সাধনার যা-কিছু সিদ্ধি এইবার শেষ হতে বসেছে। সত্তর তোলা সোনা নিয়ে—এক মুন্সীকে পাঠিয়েছেন আজ সাতদিন হলো। কে জানে কোন্ এক খেলের মালিকের খোঁয়াড়ে ছেলেটা পড়ে আছে! ছাড়িয়ে আনতে হবে। মুন্সী ফিরলে হয়। ভয় হয়—ছেলেটাতো গেছেই, এবার সোনাটাও যাবে, মুন্সীও বোধ হয় আর ফিরলো না।

রাজমাক রোডের সব কালভার্টগুলি ভেঙ্গে দিয়েছে। রোডের ধারে পর পর তিনটে খসাদারকে মেরে ফেলেছে। কারা করেছে, বুঝতে দেরী হয় না।

এ সবই সহ্য করা যায়। সুসভ্য চিকাগো কত আল কাপোনকে সহ্য করে। সাম্রাজ্যওয়ালা ইংরাজের স্নেহাধীন কলকাতা কত মীনা পেশোয়ারীকে সহ্য করেছে। তার জন্য আকাশে এক ঝাঁক বম্বোদর

বিমান ছাড়তে হয়নি। কিন্তু আজাদী বদমাসদের নতুন একটা অপরাধের খবর পাওয়া গেছে—কোনমতে তার আর ক্ষমা হতে পারে না। পূব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ থেকে তিনশো মালিক আর মেহ্‌তরের এক জির্গা হয়ে গেছে। চেনারের ছায়ায় বসে আইন তৈরী করেছে তারা, পীরগলের চূড়ার ছবি আঁকা সোনার মোহর চালু করেছে। নতুন একটী বাজার বসিয়েছে কুনার নালার ধারে। দর-বাঁধা পণ্যের লেন দেন হয়। মোহ্‌মন্দেরা বস্তা বস্তা বাদাম আনে, ইয়ুসুফজাইরা নিয়ে আসে পশম। বিবাদে বিচার করার জন্য এক প্রবীন মুল্লা কাজীর আসনে বসেছেন—জির্গার প্রস্তাবই তাঁর কাছে দ্বিতীয় হাদিস।

মারামারি ভুলে নতুন এক মিতালীর আনন্দে এক লক্ষ ডানপিটে যেন এক রাজ্যগড়ার খেলাপাতি খেলছে। ছোট্ট একটী রাষ্ট্রের পুতুল গড়েছে তারা। এই নতুন বিধান নতুন অহঙ্কারের পতাকার মত তাদের মনে মনে উড়তে থাকে। জির্গার বৈঠক শেষ হয়—শত শত উদ্ধত শির নেমাজের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ভরসা ও আশ্বাসে নত হয়ে আসে।

তাই মৃত্যুগর্ভ শান্তির মেঘ উড়ছে আকাশে। এক দানবের সংসার ছিন্নভিন্ন করতে চলেছে। ভাস্কো-ডা-গামার নখায়ুধ প্রেতাত্মা যেন এক নতুন ভারতের রক্তের গন্ধ পেয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে।

বায়ুসমুদ্রে ডানা ঝাপ্‌টে দিলীপ দত্তের মন সুখে উড়ে চলেছে। সম্মুখে পশ্চাতে ডাইনে বাঁয়ে—ছক বেঁধে এক ধূমকেতুর পরিবার যেন সীমাহীন নীলে পাড়ি দিয়ে চলেছে। নীচের দিকে তাকালে তখনো দেখা যায়, দু'একটা মিনারের গায়ে হিমকাতের প্রভাতের একটু আড়ষ্ট

আলোকের প্রলেপ লেগেছে মাত্র। তারপর যব আর জাফরাণের ক্ষেত —কতগুলি মখমলের জাজিম যেন এখানে ওখানে পাতা রয়েছে। স্বাত উপত্যকার গিরিনদীটা রূপালী ফিতার মতো একবার চক্‌চক্ করেই মিলিয়ে গেল।

এমনি করে হেসে বিদায় দিয়েছিল ডোরা। প্ল্যাটফর্ম্মের শত শত মুখের ভীড়ের মধ্যে সেই স্মিতমুখের ছবি ভোলা যায় না। ডোরা কাঁদেনি, মুখভার করেনি। কোন উদ্বেগ, কোন নিরুৎসাহ অভিমান-বাণী মুখ ফুটে বার হয়নি। শুধু ট্রেন ছাড়বার আগে হেসে একমুঠো প্রীতির কণিকা দিলীপের যাত্রাপথে মাঙ্গলিকের মত ছিটিয়ে দিয়েছিল। ডোরার বাবা মিস্টার নন্দীও সঙ্গে এসেছিলেন। পিঠে হাত বুলিয়ে সস্নেহে সমাদরে বিদায় দিয়েছেন।—যাও, বড় হও, সুনাম কর—জীবনের সব ব্রত সফল কর। বাঙ্গালীর মর্য্যাদা বাড়িয়ে তোল। তারপর, সুস্থদেহে আমাদের কাছে আবার ফিরে এস দিলীপ।

দিলীপ ভাবছিল—ডোরা যখন পরের ডাকে তার চিঠি পাবে, বিবরণ পড়ে মুগ্ধ হয়ে যাবে।

দিলীপ দত্তের ভাবনায় পুলকের বিদ্যুৎ শিউরে ওঠে। তার কারণ আছে। চিরকালের সাহসী ছেলে দিলীপ। তার গায়ের জোরের খ্যাতি সুজাবাগের মৌমাছিটীও জানে। হারু ফটোগ্রাফারের দোকানে শো-কেসের ভেতর দিলীপের একখানি ফটো যেন পৌরুষ ও রূপের নমুনা হয়ে এখনো সুজাবাগের বুকে মেডেল হয়ে ঝুলছে। তাইতো ডোরা নন্দীর মত মেয়ে···। আজ নয়—দিলীপ যখন সেণ্ট ডেনিসে পড়তো, তখন থেকেই।

বিলিতী ছাত্র-চালিয়াতির সব কায়দাগুলি বেশ দুরস্ত ছিল দিলীপের। সার্জের স্যুট ছাড়া ক্লাসে আসতো না। কোটের বুকের ওপর আল্‌মা মেটারের ইনসিগ্‌নিয়া হলদে সুতোয় আঁকা থাকতো। কলেজ ইউনিয়নের বার্ষিক উৎসবে হুড্রু ঝর্ণাতে তখন পিকনিক জমে উঠতো, পথে যেতে মোটর লরীর ছাতে বসে জ্যাক উড়িয়ে সবচেয়ে বেশী গলা ফাটিয়ে হুর্‌রা দিত দিলীপ! নন্দী সাহেবের বাংলোর বারান্দায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতো ডোরা। দিলীপের সব চপলতা ধন্য হয়ে যেত। মিষ্টি মিষ্টি হাসতো ডোরা, তাকিয়ে থাকতো ঘাড় হেলিয়ে।

হঠাৎ শোনা গেল, ডোরা নন্দীর বিয়ে প্রায় ঠিকঠাক। মোমের মত সাদা ও সিড়িঙ্গে সেই পাঞ্জাবী প্রফেসর আর্থার সিংহের সঙ্গে। দিলীপের বিহ্বল যৌবনের অভ্যর্থনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে এক চারুমুখী অ্যাফ্রোদিতে যেন হঠাৎ অকারণে মুখ ভেংচে দিল। সাহেবিয়ানার পালেস্তারার নীচে চিড়্ খেয়ে ফেটে উঠলো একটী মেটে মলিন বাঙালী-অভিমান।

সেইদিন প্রথম ধুতি-পাঞ্জাবি প'রে ক্লাশে দেখা দিল দিলীপ। সেইদিন সেণ্ট ডেনিস নতুন চোখে দেখলো দিলীপকে। দিলীপও সেণ্ট ডেনিসের এক নতুন রূপ দেখলো।

সংস্কৃতের অধ্যাপক মিষ্টার শর্ম্মা ওরফে পণ্ডিতজী দিলীপকে আড়ালে ডেকে নিয়ে সস্নেহে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন।—স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। তুম্‌হারা হৃদয় গগনমে বিবেককা সূর্য্য চমক্ উঠা হ্যায়। সম্‌ঝা?

মৌলবী সাহেব দিলীপকে দেখেই খুসীতেই থম্‌কে দাঁড়ালেন।—বাহ্‌বা বাহ্‌বা! কেয়া বাৎ হ্যয়—জওয়ান-ই-বঙ্গাল।

ফাষ্ট ইয়ারের কয়েকটী ছেলে কমনরুমে দিলীপকে ঘিরে দাঁড়ালো।—ধুতি-পাঞ্জাবীতে আপনাকে কী সুন্দর মানিয়েছে দিলীপদা!

দিলীপদা! এই সামান্য একটী সম্বোধনের আবেদন দিলীপকে যেন প্রীতিভরে গলা জড়িয়ে ধরলো।

যে-রমেশ খদ্দরের উড়ুনি গায়ে খালি-পায়ে কলেজে আসতো, কোনদিনও দিলীপের দিকে অবহেলাভরেও চোখ তুলে তাকাতো না; সেই রমেশ দিলীপকে নেমন্তন্ন করে বাড়ী নিয়ে গেল। রমেশের মা এসে দিলীপের কুশল-পরিচয় নিলেন। রমেশের বোন শোভা খাবার এনে দিল। বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পড়ে, আলোচনা করে—রমেশ দিলীপ ও শোভার একটী সুন্দর সন্ধ্যে কেটে গেল।

তোচিখেল পার হয়ে গেল। উদ্‌গ্রীব পাথুরে কেল্লাটা যেন নিঃশব্দে চুপি চুপি দেখলো—ব্যোমচর গ্রহের মত রুষ্ট বিমানবহর গোঁ গোঁ করে উড়ে পার হয়ে যাচ্ছে। দেখা যায়, উঁচু উঁচু পাহাড়ের সর্পিল বিস্তার—একটা কবচাবৃত সরীসৃপ যেন নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। সূর্য্য ওপরে উঠছে। পূব দিক থেকে একটা আলোর ঝালর হেলে পড়েছে মাটীর দেশের কুহকের ওপর। সবই ছলনা বলে মনে হয়। নীচে হাজার মীটারের ব্যবধানে মহীতল যেন মিথ্যে হয়ে গেছে।

আজ তেমনি মিথ্যে হয়ে গেছে শোভা।

ডানাভরা নতুন পরাগের আবেশে প্রজাপতি যেমন খানিক ওড়ে, খানিক বসে—কাছে আসে না, দূরেও সরে যায় না, শোভার ব্যবহারটা ছিল সেই রকম। সেই যেদিন প্রথম দেখা, সেদিন থেকে। কথা বলে

যায় ঠিক—কিন্তু উত্তরটা শোনে কিনা বোঝা যায় না। দুটো কথা বলেই হয়তো দেরাজের দিকে এগিয়ে এল; চোখে পড়লো আয়নাটা, তখুনি সরে গিয়ে ঘরের কোণের দিকে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলো। দিলীপদের বাড়ীতে বেড়াতে আসতো শোভা—ড্রইংরুমের নিভৃতে গল্পের ভেতর দিয়ে কত দুপুর সন্ধ্যে হয়ে যেত।

দিলীপ কতবার অনুযোগ করতো।—একটু সুস্থির হয়ে বসো শোভা। এ রকম ছটফট কর কেন?

শোভা।—ভয় করে।

—কেন? যদি ধরে ফেলি, তাই কি?

—না, যদি ধরা পড়ে যাই।

সেদিন এই দূরে-সরে-থাকাটাই স্বাভাবিক ছিল। হৃদয়ের দিক দিয়ে এত সান্নিধ্য ছিল বলেই। শোভার ভালবাসার হাওয়া দিলীপের মনের গায়ে গিয়ে লেগেছে। দিলীপের সাজপোষাকের রেশমী বাহার কবে যে সাদা খদ্দরে এসে শুচিতা লাভ করেছে, তা সে নিজেই ঠিক বলতে পারে না। দিলীপ একেবারে বদ্‌লে গেছে।

কার্ত্তিক পূর্ণিমার দিন ধীরাদের বাড়ীর সবাইয়ের সঙ্গে শোভাও গিয়েছিল মধুবনের মেলা দেখতে। মাত্র একটা বেলার জন্য দশ মাইল দূরে একটু ঘুরে আসা—কিন্তু যাবার আগে দিলীপের মুখভার শোভার মেলা দেখার আনন্দটুকু মাটি করে দিল। শোভার মনে হতো—ভালবাসার রীতিই বুঝি এই রকম। একটু মাত্রা ছাড়া, একটু অভিমান-ভীরু।

তাই যদি না হয়, তবে দিলীপ এত বদলে যায় কি করে?

মাস্তুদদের একটা গ্রাম। দূরবীনটা একবার চোখে লাগালো দিলীপ। অনেক দূরে একটা চেপ্টা পাহাড়ের মাথায় হাজার খানেক লোক হাঁটু মুড়ে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে আছে। পাশে এক একটী লম্বানল রাইফেল শোয়ানো আছে। আজ জুম্মার দিন। সকালবেলার নেমাজ সারছে একটা লস্করের দল। স্কোয়াড্রন উল্কার মত ঝাঁপ দেবার আবেগে স্পীড বাড়িয়ে দিল। চোখের পলক ফেরাতেই দেখা গেল—ত্রস্ত চতুর হরিণের পালের মত তর্‌তর্ করে নেমে লস্করের দল লুকিয়ে পড়লো একটা সুগভীর পাহাড়ী খাতের ভেতর।

প্রতিবছর রামনবমীর মিছিলের দিনে কসাইপাড়ার মসজিদের কাছে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা করে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটাতো। জের চলতো চারদিন ধরে। সাঁজবাতির অর্ডার আর মিলিটারী পাহারা তুচ্ছ করে সুজাবাগের অলি গলিতে অন্ধকারের মধ্যে ছুরির উৎসব চলতো।

গত বছরে দাঙ্গার সময় দিলীপ খুব নাম কিনেছিল। চকের ওপর যে ভয়ানক দাঙ্গাটা হয়েছিল, তাতে হিন্দুপক্ষের নেতা ছিল দিলীপ। বড় হিংস্র আর বেপরোয়া দিলীপের হাতের লাঠির মার। বাছবিচার নেই। চেনামুখ, অচেনামুখ, বুড়ো হোক্, জোয়ান হোক্, রোগা বা মোটা—একবার সামনে পড়লেই হলো। শিক্ষিত ডেনিসিয়ানের রুচির মুখোস যেন কিছুক্ষণের জন্য খুলে পড়ে যেত। শুধু খুলি ফাটাবার নেশায় পাগল হয়ে যেন বারভুঁয়ে বাংলার একটা লেঠেল সর্দার লাফঝাঁপ দিয়ে বেড়াত।

মিলিটারী এসে গুলি চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। প্রতিবেশীর হিংসার চেয়ে বীভৎসতর বুঝি আর কিছু হয় না। তাই সারা রাত্রি

গলিতে গলিতে ঠেঙ্গাঠেঙ্গি কোপাকুপি চলে। পথের উপর বোবা ভিখারী, বন্ধ পাগল আর ছোট ছেলের লাস পড়ে থাকে। ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে, সুজাবাগ সহরের হিন্দু-মুসলমানের মত চিরকালের ভীরু মেনিমুখো প্রাণগুলি হঠাৎ খুনী তাতারের মত হত্যার প্রেরণায় এত উতলা হয়ে উঠলো কি করে? এই চকের উপরেই গত মাসে এক মাতাল সাহেবের মোটর ইশাকের ছেলেটাকে চাপা দিয়ে মারলো। এক হাজার হিন্দু-মুসলমানের ভীড় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্যের নিষ্ঠুরতা হজম করেছিল। সাহেবটাকে ধরে থানায় নিয়ে যেতেও কেউ এগিয়ে যায় নি। শুধু এক হাজার পদদলিত ব্যাঙের ফুসফুস যেন মোটর ঘিরে দাঁড়িয়ে সুনীচ সৌজন্যে ফিসফাস্ করে আপশোষ করছিল। এখনও একটা কাবুলিওয়ালা একা ছুতোর পাড়ায় ঢুকে পেটে লাঠি খুঁচিয়ে সুদ আদায় করে আনে। সেই ইশাক্ আজ যদি দিলীপকে একবার বাগে পায়? থাক্ সে কথা। দিলীপের কথাই ধরা যাক্—খুড়িমার কার্বঙ্কল অপারেশন দেখে যার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। সেই দিলীপ আজ…।

শোভা বললো।—তুমি এসব নোংরা কাজে থেকনা দিলীপদা।

দিলীপ।—আমি গায়ে পড়ে কাউকে ঠেঙ্গাতে যাব না। তবে পাড়ার ভেতর ঢুকে উপদ্রব করতে এলে বা বেলতলার মন্দিরটাকে কেউ ভাঙ্গতে এলে বাধা দিতে হবে অবশ্য। নইলে বৃথাই এতদিন এক্সারসাইজ করে হাতের গুলি পাকিয়েছি।

—কিছু করতে হবে না তোমাকে।

—এসব ব্যাপারে তোমার গান্ধীমার্কা অহিংসা কিন্তু কোন কাজের কথা নয় শোভা।

—বেশ তো, তোমার গায়ের জোর যখন আছে, তখন দু'দলকেই লাঠিপেটা করে সায়েস্তা কর।

—কি রকম?

—হিন্দুরা যখন মুসলমান পাড়ায় আগুন দিতে দৌড়য়—তখন ওদের ঠেঙ্গিয়ে ঘরে ফিরিয়ে দিও। মুসলমানদেরও তাই কর।

—তা হয় না।

—তা হয় না যখন, তখন দু'দলকেই হাতযোড় করে বাধা দাও।

—তাতে কোন ফল হবে কি?

—তুমি একবার করেই দেখ, ফল হয় কি না?

দিলীপের মুখে মৃদু হাসি দেখে বোঝা যায়, শোভার কথাগুলি তার বিশ্বাসের মধ্যে আমল পাচ্ছে না। হাসিটা ভদ্রগোছের বিদ্রূপের মত মনে হয়।

শোভা বলে—শুনেছি, হিন্দুরা তোমাকে একটা বীর বলে শ্রদ্ধা করে। মুসলমানেরাও নাকি তারিফ করেছে—সাবাস্ দিলীপবাবুর হিম্মৎ! তাতেই বোধ হয় গলে গেছ! মেকলে সাহেবের টিটকারী মিথ্যে করে দিতে গিয়ে তোমরা শেষে গুণ্ডাগিরির মধ্যে গিয়ে পড়েছ। এটাও একধরণের পাঠা খেয়ে শক্তিপূজা। ছি ছি!

দিলীপ আর উত্তর দিল না। শোভার কথাগুলির রূঢ়তায় প্রথমে রাগ হলো। তারপর কিছুক্ষণের জন্য একটু বিমর্ষ হয়ে পড়লো। তারপর একটা অস্বস্তি। কিছুক্ষণ চঞ্চল হয়ে পড়লো দিলীপ। উঠে গিয়ে জানালার ধারে গিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। শোভা বললো—সত্যিই তুমি সিগারেট ছাড়তে পারবে না দিলীপদা?

জ্বলন্ত সিগারেট আর সিগারেটের প্যাকেটটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিল দিলীপ।

শোভা—আমার উপর রাগ করো না। যদি অন্যায় কিছু বলে থাকি, তবে আমায় মাপ করো।

দিলীপ।—না, কোন অন্যায় হয়নি। আমি কাল কসাইপাড়ায় মসজিদের সামনে একা দাঁড়িয়ে মিছিল পার করবো।

শোভার মুখ আশঙ্কায় কালো হয়ে এল।—এরকম করো না দিলীপদা।

—ভয় নেই। তুমিও আমার সঙ্গে থেক শোভা।

শোভার মুখ আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

মিলিটারী পুলিশের ট্রাকগুলি বৃথাই সিন্ধুক ভরা বুলেটের বোঝা নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ালো। পেট্রল পুড়লো শুধু। কোতোয়ালী কর্ত্তাদের তোড়জোড় এবারের শোভাযাত্রায় নতুন একটা সঙের মত মনে হলো। মসজিদের সিঁড়িতে পাশাপাশি বসেছিল দিলীপ আর শোভা। মুসলমান ছাত্রেরা এসে মাঝে মাঝে হেসে গল্প করে যাচ্ছিল। কাতার বেঁধে মুসলমান জনতা রামনবমীর শোভাযাত্রা দেখলো। শোভাযাত্রার আগে আগে লাঠিধারী পুলিশগুলি বেকুবের মত মাথা নীচু করে হাসছিল।

বেতারের অপারেটর দিলীপের হাতে একটা নোটিশ গুঁজে দিয়ে গেল। Visibility 2 Kilometers! আর নাহি দূর। একটী সুকোমল সবুজ রেজাই দিয়ে ঢাকা আকা-খেল প্রান্তর। ঠাসা গমের ক্ষেত। মাঝে মাঝে এক একটা বুড়ো দেওদারের মাথায় তখনো লম্বা লম্বা কুয়াসার জট ঝুলছে।

বাইরের ঘরে বাবার সঙ্গে নন্দী সাহেবের আলাপের হর্ষ ও উচ্ছ্বাস শোনা যায়। ডোরাও নিশ্চয় এসেছে—ওর চুলের ক্রীমের মৃদু সুগন্ধ ভেসে আসছে।

ওঁরা এসেছেন অভিনন্দন জানাতে। দিলীপের চাকরীর কথাটা শুনেছেন। আজ পর্য্যন্ত কোন বাঙালীকে যে সুযোগ দেওয়া হয়নি, দিলীপ তাই পেয়েছে। এক অভাবিত গৌরবে আজ দিলীপের কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা। ফৌজী কৌলীন্যের ফুলের মুকুটি যে বিমানসেনা, দিলীপ আজ সেই সেরা পদ ও পংক্তির সম্মান গ্রহণ করতে আহ্বান-লিপি পেয়েছে। শীঘ্রই পেশোয়ার গিয়ে ট্রেনিংয়ের জন্য কাজে যোগ দিতে হবে।

প্রফেসর আর্থার সিংহ অসুখে পড়ে ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেছে। তাই ডোরা নন্দী এখনও সিংহ হয়নি।

—সুপ্রভাত! অপ্রতিভ ভাবে হেসে ডোরা দিলীপের পড়ার ঘরে এসে ঢুকলো। ঠিক আগের মত মুখ ভরে হাসির ঝলক্ ফুটিয়ে তুলতে পারছে না ডোরা। চেষ্টা করলেও দ্বিধায় জড়িয়ে যায়।

—কেমন আছেন?

দিলীপের প্রশ্নে আরও লজ্জিত হয়ে পড়লো ডোরা। বললো।—এবার একেবারে মাটী ছেড়ে আকাশ উঠে গেলেন; ঘাসের ফুলকে কি আর চিনতে পারবেন?

—মাটীর ঢেলা আকাশ উঠলে আবার ঝুপ্ করে মাটীতেই পড়ে যায়।

—না-ও পড়তে পারেন। যদি আকাশকুসুম হয়ে যান?

দিলীপ মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। সেই প্রথম জীবনের স্বপ্নে দেখা মাটীর কোহিনুর আজ ঘাসের ফুলের মত সুলভ হয়ে গেছে।

ডোরা বললো।—আমার একটা অনুরোধ আছে দিলীপবাবু।

দিলীপ—বলুন।

—দূরে গিয়েই একেবারে পর হয়ে যাবেন না। অন্ততঃ সপ্তাহে একটীবার করে যাতে আপনার খবর পাই তার ব্যবস্থা করবেন। ভুলবেন না, আমি কিন্তু আশা করে থাকবো।

—সত্যি আশা করে থাকবে তুমি?

—হাঁ দিলীপ।

—তুমি এতদিন এই আশার কথা আমাকে বলনি কেন ডোরা? তা'হলে আমি হয়তো এ কাজটা নিতাম না। অবশ্য, এখনো নেব কিনা ঠিক নেই।

—ভুল করো না দিলীপ। তোমার জীবনের উন্নতির পথে আমি কোন বাধা দিতে চাই না, তাতে আমার যত দুঃখই হোক্ না কেন, সব সইতে পারবো। জানি, একদিন তোমায় ফিরে পাব।

(স্কোয়াড্রন ক্রমেই ওপরে উঠছে—রাবণের সিঁড়ির মত যেন ঔদ্ধত্যে স্বর্গের দিকে মাথা ফুঁড়ে চলেছে। হিমাক্ত বাতাসের জিভ ছুরির মত গায়ের চামড়া ছুলে ফেলবে। একটা কাঁপুনির বেগ পুরু ফ্লানেলের কিট ভেদ করে দিলীপের হাড়ে গিয়ে বিঁধছে।) মাথাটা রিমঝিম করতে লাগলো। বমির তোড় এল গলা ঠেলে। অসাড় নাকের নালী দিয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। অক্সিজেনের মুখোসটা চাপিয়ে কোন মতে সুস্থির হয়ে নিল দিলীপ।

শোভার জন্য দুঃখ হয়, রাগও হয়। কিরকম যেন ওর প্রকৃতি।

দাদা রমেশের কাছে দেশ-জাতি-সমাজ-স্বাধীনতার কতগুলি বুলি শিখে তোতাপাখীর মত শুধু আওড়ায়।

সুজাবাগের কে না শুনে খুসী হয়েছে? প্রত্যেক বাঙালীই শুনে বোধ হয় খুসী হবে—দিলীপ দত্ত যোদ্ধা হয়েছে। এমন বুকের ছাতি—এমন নির্ভীক দুঃসাহসী ছেলে—ও কি কলম পিষে জীবনটা ব্যর্থ করে দেবে? যোগ্য কাজই পেয়েছে দিলীপ।

এতদিন পরে অনেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে—ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল ছেলেটা। পাঁচু ডাক্তারের সেই তোখড় মেয়েটার পাল্লায় পড়ে স্রেফ ভেতো হয়ে যাচ্ছিল। ঐ মেয়েটারই নাম শোভা—এক নম্বরের স্বরাজওয়ালী। ভাই-বোনে মিলে শুধু গান্ধী-গান্ধী করে। পাঁচু ডাক্তারের পসার তো জানা আছে—ফুটো ষ্টেথিস্কোপ। দেনার দায়ে ভিটে বিকোতে বসেছে। মেয়েটাকে যদি দিলীপের মত ছেলের কাছে গছিয়ে দিতে পারে—তবে আর ভাবনা কি? ভাউচারে হাতী কেনা হয়ে গেল।

ডোরার সঙ্গে দেখা হবার কয়েকদিন পরেই শোভা উপস্থিত। দিলীপ বেড়াতে যাবার জন্য সবে সাজ সেরে গ্যারেজের দিকে চলেছে—আজ টু-সীটার নিয়ে বার হবে। আজকের সাজটার মধ্যেও নিদারুণ এক ব্যতিক্রম। সন্ধ্যে হতেই টাই-কলার-ট্রাউজারে একটী আধ-ময়লা বৈলাতিক শুকতারার মত আবার বহুদিন পরে নতুন করে চমকে উঠেছে দিলীপ।

শোভা বুঝে বুঝে ঠিক এই অসময়েই এসে দাঁড়িয়েছে—যেন পথ রুখে।

—তোমার চিঠি পেয়ে আসছি, অবশ্য আসতে লেখনি। কিন্তু

ক্ষমা চেয়েছ কেন ? লিখেছ, ভাগ্য তোমাকে ভিন্ন পথে টেনে নিয়ে চললো সেই চরম দণ্ড বরণ করে নিলে—তবু আমাদের ভালবাসার স্মৃতি চিরন্তন হয়ে থাকবে···। বেশ সুন্দর হয়েছে লেখাটা।

দিলীপ—তুমি ভুল বুঝে ঠাট্টা করছো, কিম্বা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করে······।

কথাগুলি তোত্‌লামির মত শোনালো। যেন একটা আত্মগ্লানির লাঞ্ছনাকে জোর করে এড়িয়ে যাবার জন্য ফাঁক খুঁজছে দিলীপ।

শোভা—আজ সুজাবাগের কাক-কোকিলও জানে যে তোমার সঙ্গে আমার নাকি প্রেম হয়েছে।

—তাদের এই জানা তো মিথ্যে নয় শোভা।

—বেশ তো, এখন তারা যদি কেউ তোমায় জিজ্ঞাসা করে যে, সেই প্রেমযমুনা এক লম্ফে ডিঙিয়ে তুমি চল্‌লে কোথায় ?

—বলবো, জীবনে একটা কঠোর পরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়েছি, তাই এই বিচ্ছেদ মেনে নিতে হলো।

—বাপ্‌ রে বাপ্‌। পরীক্ষা ? তার ওপর কঠোর ? সোজা কথায় যাকে বলে, একটা চাকরী পেয়েছ মাত্র। বাঙালীর ভীরুতার অপবাদ ঘোচাবে, মিছে কেন এত সব বড় বড় কথা বলছো দিলীপদা ? বল, তোমার নিজের অপবাদ ঘুচবে—তুমি নিজে বীর হবে, যোদ্ধা হবে। তাই দিয়ে বাঙালীর বীরত্ব বোঝায় না।

—কেন বোঝায় না ?

—যেমন তুমি মোটর গাড়ীতে বেড়াও মানে বাঙালী জাতির মোটর গাড়ীতে বেড়ানো বোঝায় না।

—আমার একটা খুব সোজা কথার উত্তর দেবে শোভা; সত্যিই কি বিশ্বাস কর তুমি, চরকায় সুতো কেটে স্বরাজ পাওয়া যাবে ?

—মেনে নিচ্ছি, পাওয়া যাবে না। এবার তুমিই বল, কি করে পাওয়া যাবে।

—যুদ্ধ করেই পেতে হবে, পৃথিবীর আর পাঁচটা পরাধীন জাত যে ভাবে লড়াই করে স্বাধীনতা পেয়েছে, সেই ভাবে।

—তা'ও মেনে নিলাম।

—তাই, বাঙালীকে শুধু কলমবাগীশ কেরাণী হয়ে থাকলে চলবে না। যুদ্ধবিদ্যা শিখতে হবে।

—অন্য সময় হলে তোমার মত লোকের মুখে একথা শুনলে রসিকতা মনে করে হাসতাম। কিন্তু আজ সত্যিই দুঃখ হচ্ছে। যুদ্ধে চাকরী করা আর যুদ্ধবিদ্যা শেখা কি একই ব্যাপার দিলীপদা? এই তত্ত্বটা কি তোমাকে বুঝিয়ে বলার দরকার আছে? তুমি তোমার মনকেই প্রশ্ন করে দেখ একবার।

সুবিজ্ঞা আচার্যার মত শোভা উপদেশ শুনিয়ে যাচ্ছে। দিলীপের মনের তারগুলি ক্রমেই বিরক্তিতে মোচড় দিয়ে কড়া হয়ে উঠতে লাগলো। বললো।—তুমি কোন নতুন কথা শোনাচ্ছ না শোভা, তোমারই মত গোঁড়া ঠাকুরমাদের ঠাকুরমায়েরা এই যুক্তি দিয়েই হিন্দুর ছেলের সমুদ্র-যাত্রাকে পাপ মনে করতেন। সব বিদ্যারই অধিকারী হতে হলে আগে ছাত্র হতে হয়। ছাত্র হওয়াকে চাকরী করা বলে না।

শোভাকে এতক্ষণ সত্যিই যেন আততায়িণীর মত দেখাচ্ছিল। দিলীপের বিরক্তিভরা উত্তর শুনে চোখ নামিয়ে নিল। না, আজ আর দাবী

করে বলবার কিছু নেই। চুপ করে হেঁট মুখে দাঁড়িয়ে রইল শোভা। দিলীপের মনে হলো—বড় বেশী কালো দেখাচ্ছে শোভাকে। বোধ হয় এত ঘামিয়েছে আর হাঁপাচ্ছে তাই। মমতা হয়, কেন এরা মানুষকে শুধু পেছনে টেনে রাখতে চায়। জানে না, তাতে কোন ফল হয় না। দিলীপ একটু অনুনয় করে বললো—দুঃখ করো না শোভা।

শোভা—যুদ্ধ শিখতে হলে মানুষ মারতে হয়, সেটা জানতো?

দিলীপ—শত্রুকে মারতে হয়।

—তুমি শত্রুকে চেন?

—চেনবার কোন প্রয়োজন হয় না।

—আমাকে জব্দ করার জন্য গায়ের জোরে কিছু বলো না দিলীপদা। আমার কথার উত্তর দাও।

—না, উত্তর দেবার কিছু নেই।

দিলীপের কথাগুলি ক্রমেই রুক্ষ হয়ে উঠছে—পালাবার পথ না পেলে বেড়াল যেমন রুষ্ট হয়ে ওঠে। শোভাও তেমনি ঢিট মেয়ে, সব অপমান সহ্য করে আজ যেন একটা হেস্তনেস্ত করার জন্যই সে এসেছে। বললো—তুমি এই চাকরী নিও না। তুমি নিজেই বুঝতে পারছ না যে, তোমার দ্বারা এসব কাজ হতে পারে না।

—কেন?

—দশজনের বাহ্‌বা আর হাততালির উস্কানিতে দাঙ্গা করতে গিয়েছিলে, ভুল বুঝতে পেরেছিলে। এবারও হাততালির তারিফ পেয়ে যোদ্ধা হতে চলেছ।

দিলীপ শোভার কাছে এগিয়ে এসে সান্ত্বনার সুরে বললো—আজ

অন্ত কথা কি আর কিছু বলবার নেই শোভা? শুধু আমার চাকরীটা নিয়েই তোমার দুঃখ? আমি চলে যাব, শুধু এই কথাটা ভেবে তোমার কি······।

শোভা এইবার হেসে ফেল্‌লো।—সে দোহাই দেবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে ডোরা। থাক্, সেসব কথা।

একটী কথার আঘাতে দিলীপের সব মুখর চপলতা স্তব্ধ হয়ে গেল। কিছু একটা বলবার জন্য বৃথা চেষ্টা করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল শুধু।

শোভা—এইবার আমি যাই। অনেক সময় নষ্ট করলাম।

থার্মোমীটারের পারা শূন্য সেন্টিগ্রেডের নীচে বিশ ডিগ্রী নেমে গেছে। সময়ের প্রবাহ যেন ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে এক চরম লুপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। বিমানবহরের সেই একটানা সরোষ গুঞ্জন আর নেই। অদ্ভুত এক শব্দের উৎসবে মহাব্যোম স্পন্দিত হচ্ছে—যেন গান গাইছে একটা বিদেহী পরমাণুর জগৎ। আলোক ও শব্দের গুঁড়ো ছড়ানো এই বায়ুর দেশে পৃথিবীর জ্ঞানবুদ্ধি অসহায় হয়ে পড়ে। দিলীপ দত্ত বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তাকিয়ে থাকে। বিজ্ঞানী হওয়া উচিত ছিল তার, তবেই না এই পদার্থ-প্রপঞ্চের কিছু রহস্য লুঠ করে নিয়ে যেতে পারতো। যদি এখানে কেউ আসে, সে যেন এই অগোচরের অহঙ্কার ভেঙে এক মুঠো আলোক-কণিকা বন্দী করে নিয়ে যায়; মাটীর দুনিয়ার মান রাখতে হলে তার চেয়ে বড় কাজ আর কিছু নেই।

ডোরাকে এইসব কথা লিখতে হবে। কিন্তু সে কি খুসী হবে?

খুসী হতো যে, সে আজ পথ থেকে সরে গেছে। বোধ হয় এখন বিলিতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করছে। হয়তো ছ'মাস জেলও হয়ে গেছে।

স্কোয়াড্রন বধ্যভূমির ওপর পৌঁছে গেছে। নীচে ওয়াজিরিস্তানের বিচিত্র প্রান্তর—ছোট ছোট গ্রাম ক্ষেত আর বাগিচা। পাহাড়ের ঢালুতে ভেড়া চড়ছে। বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে একটা আবেশ আসে। শিল্পী হয়ে এই ছবি এঁকে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। বিশ্বাস হয় না, পৃথিবীতে ধূলো আছে, কাঁটা আছে, বিষ আছে। সবই মিথ্যা অপবাদ বলে মনে হয়। মাটীর পৃথিবীর এই রূপ মানুষেরা জানে না। তাই তারা স্বর্গ কামনা করে। শিল্পী হওয়া উচিত ছিল দিলীপের।

একটা বাজার। তাজটুপি আর পাগবাঁধা শত শত মাথা কিলবিল করছে। বাজারের পাশে খাড়া পাহাড়টার মাথায় একটা জীর্ণ বৌদ্ধ স্তূপ। পাথরের গায়ে ঘুলঘুলির মত কতগুলি গুম্ফা—কতগুলি কালো চোখের কোটর যেন আকস্মিক দুঃস্বপ্নে বিক্ষত হয়ে রয়েছে।

ভারতবর্ষের কোন্ ছাত্র না ইতিহাসে পড়েছে? মীরাগ্রাম থেকে তক্ষশিলা—তক্ষশিলা থেকে পুরুষপুর—পুরুষপুর থেকে রাজগৃহ। এই সেই পুরাতন হৃদয়ের পথ আজও পড়ে রয়েছে—অবহেলা ও অপরিচয়ের কাঁটায় ঢাকা। সেই যুগ যুগের কুটুম্বিতার সুখস্মৃতি যেন বিষণ্ণ বেদনায় পাহাড়টার মাথায় ভেঙে আছে। আজ কিন্তু সেই……।

দিলীপের হঠাৎ মনে পড়ে যায়—রসিদ খলিফার মামাবাড়ী এই দেশে।

রসিদ খলিফা। দিলীপের ঠাকুর্দার আমলের দরজী। আজও সে বেঁচে আছে। সাদা শণের মত ফুরফুরে তার দাড়ি, পাকা ডালিমের

মত গায়ের রঙ। ছেলেবেলায় পূজোর সময় জামা সেলাই নিয়ে রসিদের সঙ্গে দিলীপের প্রতি বছর একটা সংঘর্ষ বাধতো। জামার ছাঁট মোটেই পছন্দসই হতো না দিলীপের। বুড়ো রসিদকে খিম্‌চে চড়ঘুসি মেরে নাজেহাল করতো দিলীপ। তারপর দেয়ালীর সময়, লেপ সেলাই করতে আসতো রসিদ। দিলীপ বসে বসে রসিদের কাছে গল্প শুনতো—রসিদের মামাবাড়ী ওয়াজিরিস্তানের গল্প।

শত্রুপুরী নয়, সেই রূপকথার দেশ আজ তার পায়ের নীচে। রাবণের সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠে দিলীপ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছে সেই দেশ। কখন্ আবার বিদ্যুতের ঘন্টি বেজেছে, কাজের অর্ডার এসেছে—দিলীপ কিছুই জানে না। ঠাণ্ডা আয়নার মত তার চোখ দুটোতে শুধু নীচের পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি চিক্‌চিক্ করছে। বোমা পড়ছে—এক একটী বিস্ফোরণে এক একটী প্রকাণ্ড ধোঁয়ার গোলাপ হঠাৎ পাঁপড়ি মেলে ফুটে উঠছে। বাজারটা আর নেই। শুকনো পাতার মত কতগুলি নিরুপায় ভূচর প্রাণ এক ঝড়ের ঝাপ্‌টায় ছিট্‌কে পড়ছে চারদিকে।

দিলীপের সহকর্ম্মী দুজন উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে চলেছে। ওদের চোখে মুখে কী অকপট সংহারের আনন্দ। শুধু দিলীপের অন্তরাত্মা যেন ধরা-পড়া চোরের মত আসরের এক কোণে মাথা গুঁজে পড়ে রইল।

শুধু মনে পড়ে—রসিদ খলিফার মামাবাড়ী। হিমে নয়, বৈরাগ্যে নয়—নিতান্ত এক পার্থিব মমতার আবেশে দিলীপের সম্বিৎ অসাড় হয়ে রইল। নীচে যে জীবনের সুখদুঃখের নর্ত্তন চলেছে, সে নিজেই যে তার একটী উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত জীবাণু। সেখানে রসিদ খলিফার মামাবাড়ী

—মৃত্যুর ডেলা ছুঁড়ে মারতে হাত ওঠে না। একেই বলে ভীরু কাপুরুষ, একেবারে হৃদয় তাপের ভাপে ভরা ফানুস।

বোম্বারের দল ঘাঁটিতে ফিরে এসেছে। বিমানের ভেতর থেকে মূর্চ্ছাহত দিলীপ দত্তকে বের করে একটা ষ্ট্রেচারের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে। ধড়াচূড়া ছেড়ে কয়েকটী গগনবিহারী ষণ্ডা ষণ্ডা ডার্বিশায়ার দুলাল চায়ের বাটি হাতে নিয়ে আরামে চুমুক দিচ্ছে। দিলীপের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

ঠিক মূর্চ্ছা নয়, চোখ মেলে তাকাতেই পারছিল না দিলীপ। অভিযান এখনো শেষ হয়নি—আরো পথ বাকী আছে। এখান থেকে হাসপাতাল, তারপর হেড কোয়াটারে চালান, তারপর তদন্ত। তদন্তের শেষে বরখাস্ত। একটী মেকী বীর্য্যবন্তের কুশপুত্তলিকা আবার চুপি চুপি হাওড়া এক্সপ্রেসে চড়ে বসবে। আবার সুজাবাগ ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম। টেলিগ্রাম পেয়ে বাবার আর্দালি আর টু-সীটার এসে অপেক্ষায় বসে থাকবে।

ডোরা আসবে, নন্দীসাহেবও বোধ হয়। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ডোরা ফুলের তোড়া হাতে তুলে? কতক্ষণ তার সুন্দর ঠোঁট দুটীতে হাসি ফুটে থাকবে? এক মিনিট দুমিনিট···পাঁচ মিনিট। তারপর আর বুঝতে বাকী থাকবে না।

দিলীপের মুখের দিকে তাকিয়ে ডোরার হাত কাঁপতে থাকবে। সেই ধিক্কারে ফুলের তোড়া লুটিয়ে পড়বে প্ল্যাটফর্মের কাঁকরের ওপর। ফুলের তোড়াটা হাত তুলে দিলীপ নিতেও পারবে না, মাটী থেকে তুলে ফিরিয়ে দিতেও পারবে না। শুধু নিঃশব্দে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে দিলীপ।

নতুন শালিক

এই জায়গাটার নাম কাঁকুলিয়া। গেঁয়ো চব্বিশ পরগণা আর সহুরে কলকাতা এখানে এসে এখনো একদেহে লীন হতে পারেনি; বরং তার উল্টোটাই সত্য। দু'জনে যেন আক্রোশে পরস্পরের গলা টিপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সহুরের ইচ্ছে গেঁয়োকে উদ্বাস্তু করতে, গেঁয়ো চাইছে সহুরের অনধিকার প্রবেশের উৎপাতকে ট্রামলাইনের ওপারে ঠেলে রাখতে। তবু লক্ষণ দেখে বোঝা যায়—লোহা লক্কড়, কাঁচ কংক্রীট, গ্যাস পীচ আর বিদ্যুৎ নিয়ে সহরের এই রাবুণে আক্রমণে গাঁয়ের সীতেপণা আর বেশী দিন চলবে না।

মাঠের ওপর দিয়ে যে সরু এবড়ো-খেবড়ো সুরকি-ছড়ানো রাস্তাটা রেল লাইন পর্য্যন্ত পৌঁছেছে, তারই ওপর একজায়গায় মাধবী-নিবাস; ছোট বাড়ীটা একেবারে আগাগোড়া লতাপাতায় ঢাকা! নোনাধরা বিবর্ণ একটী থামের গায়ে সিমেণ্টে গাঁথা নামটা এখনো লতার ফাঁকে উঁকি দিয়ে আছে। বাড়ীর পেছনে একটা ডোবা, ঝুমকো জবার ডালাগুলি প্রায় জলের ওপর নুয়ে থাকে। বাড়ীর কর্ত্তা রঘুনাথবাবু গড়েহাটা রোডের ওপরেই এক কাঠের আড়তে হিসেব লেখার কাজ করেন।

কাছাকাছি আর কোন বাড়ী ছিল না। সম্প্রতি কয়েকটা হয়েছে। কাঁকুলিয়ার নারকেলের ঝালরের ঝিরঝিরে ছায়ার নীচে সে-বাড়ীগুলি বেশী বেমানান হয়নি। সবই দালান বাড়ী বটে, তবে তাদের গায়ে গাঁয়ের আদরটুকু মাখা থাকে—দোপাটীর বেড়া, উঠোনের কোণে একটা

গন্ধরাজ, পেছনে দু-চারটে কুমড়োর মাচা। এক বাড়ীতে গায়ে-হলুদের উলু দিলে—দূরে ও নিকটে বিশটা বাড়িতে শোনা যায়। সবাই বুঝতে পারে, নিত্যবাবুর ভাইঝি পারুলের বিয়ে।

রঘুনাথবাবু ছাড়া মাধবী নিবাসে আর যারা থাকে, তারা সংখ্যায় বেশী নয়। রঘুনাথবাবুর স্ত্রী, মেয়ে সুধা আর ছেলে ভম্বল—যার বয়স মাত্র সাত বছর। মাধবী-নিবাসের এই ক্ষুদ্র পরিবারের গৃহবলিভুক্ কুকুরটার নাম নেলো। একটু রোগাটে চেহারা, হয়তো ভাল করে খেতে পায় না বলেই। নেলোর ক্ষান্তিহীন পাহারাই মাধবী-নিবাসের আসল প্রাচীর। নেলো সিঁড়ির ওপর শুয়ে শুয়ে ধোঁকে, কিছুক্ষণ ঘুমোয়, পর মুহূর্ত্তেই একটা মেঠো ইঁদুরকে তাড়া করে সীমানার ওপার করে দিয়ে আসে।

আর আছে দুটো গরু, তার মধ্যে একটার নাম নতুন শালিক। এ নাম ভম্বলের দেওয়া। নতুন শালিককে কখনো খুঁটোয় বাঁধতে হয় না। নিজের মনেই বাড়ীর আশে পাশে চরে বেড়ায়। কাছাকাছি যদি কখনো দেখতে না পাওয়া যায়, ভম্বল পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে একটা ডাক ছাড়ে—নতুন শালিক···। নতুন শালিক তখন হয়তো স্লিট ট্রেঞ্চের ধারে কচি ঘাস চিবিয়ে ফিরছে। ডাক শুনেই সাড়া দিয়ে ছুটতে ছুটতে চলে আসে।

সুধা কলেজে পড়ে; অনেক কষ্ট করে পড়তে হয়। ঘরেকাচা কালো-পাড় মিলের সাড়ী দিয়েই সুধাকে সাজ-সজ্জা সারতে হয়। এর ওপরে যাবার মত আর্থিক সামর্থ্য ওদের নেই। স্যাণ্ডেল পায়ে দু'মাইল পথ হেঁটে কলেজ যাওয়া-আসা সুধার অভ্যাস হয়ে গেছে।

বিকেলে যখন ক্লান্ত হয়ে, ঘামে ভিজে, রোদে ঝলসানো মুখ নিয়ে সুধা ঘরে ফেরে, তখনো ওকে সুন্দর দেখায়।

আজ না হয় রঘুনাথবাবু মাথাভরা কাঁচাপাকা চুল আর অশক্ত দেহ নিয়ে কাঠের আড়তে হিসেব লিখছেন! কিন্তু তাঁর পঞ্চান্ন বছরের জীবনের দুঃখে-সংগ্রামে ও আদর্শে পোক্ত একটী মেরুদণ্ড আছে, যা কোন আন্দামানের লগুড়ের আঘাত ভাঙতে পারেনি। সেদিক দিয়ে বিচার করলে সুধা হয়েছে বাপেরই উপযুক্ত মেয়ে। কাব্যি করে বললে অত্যুক্তির মত শোনায়, তবু কথাটা সত্যি—সুধা যেন রঘুনাথবাবুর ছেলেবেলায় দেখা মুক্তির স্বপ্ন, আবার নতুন করে দুরন্ত হয়ে উঠেছে। সুধা পলিটিক্স নিয়ে মেতে আছে, তবু রঘুনাথবাবু কোন নিষেধ করতে পারেন না। সেটা যেন নিজেকেই নিষেধ করা হবে। তাছাড়া, সুধা তো পাশ করে যাচ্ছে ঠিক—পয়সার অপব্যয় হচ্ছে না।

রঘুনাথবাবু বলতেন—সুধা, তোদের আন্তর্জ্জাতিকতার কথাগুলি আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

সুধা—আমরা সবদেশের দুঃখীদের মুক্তি চাই, সর্বজাতির পীড়িতদের সেবা করতে চাই। আমাদের বিশ্বাস, পৃথিবীর পীড়িতেরা সবাই মিলে যেন একটী জাত!

রঘুনাথবাবু—আমারও তাই বিশ্বাস। কিন্তু সর্বজাতির পীড়িতদের একত্রে পাবি কোথায়, যে সেবা করবি?

সুধা—আমাদের আশেপাশেই তারা রয়েছে। আমাদের দেশের ক্ষেতে মাঠে অফিসে কারখানায়।

রঘুনাথবাবু—আমিও তো তাই বলি। তবে মিছে আমাদের ঘরকুনো বলে নিন্দে করিস্ কেন?

সুধা হাসতে থাকে।

একটা পার্টি আর সমিতি আছে, সুধা তারই সদস্যা; অথবা ভলান্টিয়ার, কর্ম্মিনী বা ব্রতিনী যে-কোন আখ্যা দেওয়া যায়। বর্ম্মা থেকে হৃতাশ্রয় শত শত অভাগা প্রতিদিন শেয়ালদায় ট্রেণ থেকে নামে। রোগে অনাহারে ও পথক্লেশে জীবগুলি যেন সারা হয়ে গেছে। মাড়োয়ারী সেবা সমিতির রিলিফ ক্যাম্পে গিয়ে পার্টির নির্দেশ মত সেবা-কমিটির সহকর্ম্মিনীদের সঙ্গে সুধাকে খাটতে হয়। কলেজ কামাই হয়। বাড়ী ফেরে হয়তো রাত্রি এগারটা বারটায়। আশ্রয়-প্রার্থিনী মেয়েদের কোলের ছেলেদের দুধ জ্বাল দেওয়া থেকে সুরু করে খিচুড়ি-তরকারী রান্না পর্য্যন্ত, সব কাজ শেষ করে হলুদ-মসলার দাগে সাড়ীটার দফা সেরে সুধা বাড়ী ফেরে।

মাধবী-নিবাসের সামনে একটা পতিত জমি শুধু কচুবনে ছেয়ে ছিল। আজ কমাস ধরে সেখানে একটা বাড়ী উঠছে। বড় বড় মার্বেলের শ্ল্যাব আসছে, নানারকম ইস্পাতের ফ্রেম, সেগুনের চৌকাঠ, ঘসাকাঁচের সার্সী। রোজ সকাল বিকেল ইঞ্জিনিয়ারেরা এসে তদ্বির করে যান। বাড়ীটা একমহল দুমহল করে চড়ে উঠছে; একটা অতিকায় কংক্রীটের সরীসৃপ যেন ফণা তুলে উঠতে উঠতে চারতলায় এসে শান্ত হলো।

বাড়ীটার নামকরণ হয়ে গেল—দি সান্নি নুক—The Sunny Nook; কিন্তু গৃহপ্রবেশের দিন সকলকে আশ্চর্য্য করে দিয়ে এক

কেলেটে চেহারার বাঙালী-সাহেব পরিবার বাড়ীতে এসে ঠাঁই নিল। মিঃ এন কে (নিশিকান্ত) রায়, তাঁর স্ত্রী ও একটী তরুণী—অর্থাৎ বুড়োবুড়ী ও তাঁদের মেয়ে। এক বছর পার হয়ে গেলেও পাড়ার কোন ভদ্রলোক এঁদের কুলশীলের কোন খবর পেল না। এঁরা কারও সঙ্গে মেশেন না, সমোটর বাড়ীতে ঢোকেন এবং সমোটর বেরিয়ে যান। চাকর মালী খানসামা ও ড্রাইভার নিয়ে একটা ভৃত্যগোষ্ঠী আছে। কিন্তু তারাও কেমন একটু অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। প্রতিবেশী কোন ভদ্রলোক প্রশ্ন করলে মালীটা তবু কথা ব'লে উত্তর দেয়, খানসামা ইঙ্গিতে হাঁ-না জানিয়ে দেয়, গোয়ানীজ ড্রাইভারটা তাকাতেই চায় না। কিন্তু সাতহাত উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখলেই কি অন্দরের পরিচয় আটকে রাখা যায়? তাহলে আর মহেঞ্জোদাড়োর রহস্য আবিষ্কৃত হতো না।

এন-কে রায় একজন ব্যাঙ্কার এণ্ড জেমিন্দার। সরল করে বললে বলা যায়—গোটা দশেক লোন অফিস হয়তো আছে, যার কারবারী কীর্ত্তি আসলে কাবুলী নিয়মেই নিষ্পন্ন হয়, তার ওপর কর্ণওয়ালিশী কৌলীন্যের কৃপা। পার্থক্যের মধ্যে—হিসেবটা ইংরাজীমতে রাখা হয়, চোরা অডিটার দিয়ে খাতা গুছিয়ে রাখে ইন্‌কমট্যাক্সকে ফাঁকি দেবার জন্য। একটা অসদোপার্জ্জনকে গালভরা নাম দিয়ে রেজিষ্টারী করে যেসব ক্ষুদে ক্ষুদে জগৎশেঠ দেশকে বিকিয়ে দিতে বসেছে, এন-কে তাদেরই একজন। শোনা যায় বিলিতি বুলেটের চেয়ে আমাদের দমদম বুলেট আরো ভয়ঙ্কর।

সান্‌নি মুকের ফটকের লোহার জাফ্‌রির ওপারে একটা ভীষণদর্শন

টেরিয়ার সারাদিন মেজাজের গরমে চীৎকার করে ফেটে পড়তে থাকে। ফেরীওয়ালা, ভিক্ষুক বা ঠুলি-লাগামের সাজ-পরা ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়া—পথ দিয়ে যেতে দেখলেই টেরিয়ারের বৈরনির্য্যাতনের উৎসাহ উন্মত্ত হয়ে ওঠে। দরজার গরাদ নখ দিয়ে সরোষে আঁচড়াতে থাকে।

মেয়েটার নাম মীর্ণা। নামটা আগে হয়তো মীনা ছিল, এখন ফিরিঙ্গিয়ানার অলঙ্কারের ভারে মীর্ণা হয়ে গেছে। যেসব লোক সন্ধ্যায় চায়ের আসরে এসে হাসাহাসি করে, এ'নাম হয়তো তাদেরই দেওয়া। অথবা মিস্ রায় নিজেই সাধ করে নিয়েছে। মীর্ণাও কলেজে পড়ে, কিন্তু এমন একটা কলেজে যেখানে বার আনা ছাত্রী সাদা-কালো দো-আঁসলা জাতের মেয়ে আর বাকী চার আনা বিশুদ্ধ সাদা। এ কলেজের মেয়েরা অনেকে মদ খায়, সিগারেট খায়, সাইকেল চড়ে, বাস্কেট বল খেলে। মীর্ণা রায় সিগারেট খায়, গোপনে মদ খেতে আপত্তি নেই—যদিও বুড়ো এন-কে এখনও এ খবর জানে না। তবে সাইকেল চড়তে পারে না মীর্ণা—বয়সের অনুপাতে চেহারাটা বড় বেশী মুটিয়ে গেছে। বাস্কেট বল খেলতে গিয়ে কোমরে চোট লেগেছিল প্রথমদিন; তারপর ওপথ ছেড়ে দিতে হয়েছে।

মীর্ণা রায়ও ঐ পার্টি আর সমিতিটার সদস্যা। সন্দেহ হতে পারে সমিতিটাকি বারোয়ারী গাজনতলা যে, যার ইচ্ছা সেই এসে একবার ঢাক পিটিয়ে নেচে যাবে? কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা নেই? নেই নিশ্চয়, নইলে মীর্ণা রায় এখানে কি করে ঢুকতে পারে?

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় মীর্ণা রায় ঐ সমিতির খাসদরবারের একজন। সুধার মত আর সব মেয়ে-কর্ম্মীদের কাছে এটা ধাঁধাঁর

মত লাগে। সমিতির পরিচালকদের সদ্বুদ্ধি সম্বন্ধে সংশয় জাগে। কিন্তু সুধার মত মেয়েদের অহমিকা এখনো এত প্রখর হয়ে ওঠেনি, তাই বিসম্বাদ সৃষ্টি করতে ওরা চায় না। সাধনার ক্ষেত্রে এখনো ওরা ছাত্রী হয়েই থাকতে চায়—শিক্ষা নিতে চায়—পরীক্ষা দিতে চায়। তাই ওরা চুপ করে থাকে।

কিন্তু মিষ্টার এন-কে কোন্ পরাণে এই ক্ষুরস্থ ধারা ইব সমাজসেবার পথে মেয়েকে ছেড়ে দিলেন ?

এন-কে শুনেছিলেন যে সমিতিটার আদর্শ হলো আন্তর্জাতিক সেবা। কথাগুলি বড় গোলমেলে লেগেছিল। পরে অনেক ভেবেচিন্তে বুঝলেন, বোধ হয় সি-এস-পি-সি-এ'র মত কোন নিরীহ প্রতিষ্ঠান হবে। কুমার শিবেন্দ্র ভৌমিকের মত বিলেতফেরত জমিদার বাচ্চাও যখন এই সমিতির আদর্শকে বেছে নিয়েছে, তখন মীর্ণাও সেই দিকে যাবে; ভবিষ্যতে যে-দুজনের জীবন দাম্পত্যের বন্ধনে ধরা দেবে, আজ আদর্শের আসরে তারা ভিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। এন-কে খুসীই ছিলেন—সমিতিটা বেশ সুন্দর ঘটকালি করছে।

সমিতির বৈঠকে সুধা আর আর মীর্ণার মধ্যে কতবার মুখোমুখি দেখা হয়েছে, কিন্তু বার্ত্তা বিনিময় হয়নি কখনো। কাঁকুলিয়ার পথেও দেখা হয়েছে—কতবার চোখাচোখি হয়েছে। কিন্তু দুজনের মাঝে যেন এক বৈতরণীর ব্যবধান, এমনিভাবেই তারা দু'জনে দু'জনকে তাকিয়ে দেখে। তবু এদের ব্রত এক, আদর্শ এক, বৈঠকের প্রস্তাবে দুজনে সমান আগ্রহে হাত তুলে সম্মতি জানায়।

মীর্ণা রায় সত্যিই যেন আন্তর্জাতিকতার একটি চলচ্চিত্র। অঘ্রানের

সন্ধ্যায় কাঁকুলিয়ার বাতাসে এমন কিছু হাড়কাঁপানো হিম থম্‌থম্‌ করে না; কিন্তু মীর্ণা রায়ের ফারের পোষাক দেখে মনে হয়—আল্‌প্‌সের কোন উপত্যকার এক কুকুর-সঙ্গিনী মেয়ে বরফঢাকা পাহাড় ডিঙ্গোতে চলেছে। চায়ের আসরে কত জাতের লোক যে আসে তার বর্ণনা চলে না। আসরেতে সমিতির আদর্শ ব্যাখ্যা করে অভ্যাগতদের বোঝানো হয়। বেঁটে বেঁটে চীনে কাপ্তেন, ঢ্যাঙা মার্কিন মিলিটারী অফিসার, ইংরেজ সাংবাদিক—তাছাড়া দিশী রমের বোতলের মত দীনহীন চেহারা প্যাণ্টালুন-পরা বাঙালী প্রফেসর কয়েকটা আসে। এইসব বিচিত্র মসলা দিয়ে তৈরী এক অদ্ভুত আন্তর্জাতিকতার সালাড চেটে সন্ধ্যার সান্‌নি নুক তৃপ্তির উদ্গার তোলে। ভবিষ্যতের এক গিল্‌টিকরা সোনালী ফেরদৌসের স্বপ্নে এদের ভাবনায় রিমঝিম সুরের আবেশ লাগে। মীর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে অনেকের তাঁমাকের পাইপ হাত থেকে ফস্কে পড়ার উপক্রম হয়। সব শেষে মীর্ণা রায় এক প্যাকেট চকোলেট উপহার দেয়—কেনাডিয়ান সৈন্যদের জন্য। ধন্যবাদ, সাধুবাদ, স্তুতি ও অভিনন্দের ঝড় জেগে ওঠে।

ভম্বল স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে। রঘুনাথবাবু একটু চিন্তায় পড়লেন—মাসিক খরচের অঙ্ক বাড়লো। উপরি কয়েকটা টাকার সংস্থান না হলে আর চলে না। কাজেই মাধবী-নিবাসের সঙ্গে সান্‌নি নুকের একটা যোগসূত্র দেখা দিল। একদিন দেখা গেল, ধরণী গয়লা নতুন শালিককে হেঁচড়ে নিয়ে এসে সান্‌নি নুকের ফটকের কাছে দাঁড় করালো দুধ দুইবার জন্য।

খাঁটি দুধের জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। রঘুনাথবাবু রায়-সাহেবকে দুধ বেচছেন আজকাল। ধরণী দুধ দোয়, ভম্বল কাছে দাঁড়িয়ে দেখে। মীর্ণা আর বুড়ো এন-কে পায়চারী করে বেড়ান। সতর্ক দৃষ্টি রাখেন—দুধে জল মেশানো হচ্ছে কিনা।

দুধের খাঁটিত্ব সম্বন্ধে তবু সংশয় ও অভিযোগের অন্ত ছিল না। মীর্ণা প্রায়ই ভম্বলকে বলে—তোমার বাবাকে বলে দিও খোকা, গরুটার দুধ ভয়ানক খারাপ। এরকম হলে দাম কাটা যাবে।

মীর্ণা আসলে এই গরুটাকে পছন্দই করতো না—বোধ হয় ঐ নামটার জন্য। এক একদিন বিদ্বেষ চেপে রাখতে পারতো না মীর্ণা। ভম্বলকে আবার কথা শুনতে হতো—খোকা, গরুর নাম শালিক রেখেছ কেন? তোমার নাম যদি বুল ডগ রাখা হয়, তবে সেটা কি ভাল শোনাবে?

শেষকালে নতুন শালিককে নিয়েই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে গেল।

রবিবারের বিকেল বেলা সুধা জানালার ধারে বসে বই পড়ছিল—নব্য-রুশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস। জাতির মুক্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রী চাষী-মজুরের প্রচণ্ড সংগ্রামের কাহিনী। তারা শত্রুকে যখন স্পষ্ট করে চিনে ফেললো, তারপর আর দ্বিধা করেনি। আভিজাত্যের জারজ হিংসার সিংহাসনকে হিড় হিড় করে টেনে নামিয়ে চুরমার করে দিয়েছিল তারা। তাদের সেই আদর্শে জোড়াতালি ছিল না, মিথ্যার সঙ্গে আপোষ ছিল না······।

সুধা দেখলো—মীর্ণা কুকুর নিয়ে পথের ওপর পায়চারী করছে।

নিজের ভাবনার মাঝখানেই সুধা হঠাৎ হেসে ফেললো। ঐ মীর্ণা নাকি তারই সহব্রতিনী—এক আদর্শের সূত্রে দুজনে বাঁধা! ঘৃণায় গা শিরশির করে উঠলো সুধার। মীর্ণার আদর্শ? পথের কাঁটারাই যদি নিজেদের পথ বলে জাহির করে! আদর্শের মিল? কোথায়? এ-যে জীবন দিয়ে গড়া ব্যবধান! মীটিংয়ের কোন কোরাস সঙ্গীতের নাকিসুর এই ব্যবধান ভেঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারবে না। সমিতিটারও যেন কেমন মতিচ্ছন্ন হয়েছে! কয়েকটা বড়লোক কিছু মোটা চাঁদা দেয় বলেই কি এমন ভাবে মুখ বুজে অনধিকারীর নষ্টামি সইতে হবে?

কুকুরের ঝগড়ার বিদ্‌ঘুটে চীৎকারের শব্দ। সুধা তাকিয়ে দেখলো —টেরিয়ারে আর নেলোতে মারামারি লেগে গেছে। নেলোটা যদি এখনো ভালয় ভালয় পালিয়ে যায়, তবে বাঁচতে পারে। কিন্তু নেলো যেন ক্ষেপে গেছে, মরিয়া হয়ে টেরিয়ারের ওপর দাঁত খিঁচিয়ে লাফিয়ে পড়ছে বারবার। টেরিয়ার নেলোর টুঁটি কামড়ে মাটীর ওপর এক ঝাপটে চিৎ করে চেপে ধরলো।

অসহায়ের মত ছটফট করছে নেলো—চীৎকার ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। তার ওপর ড্রাইভারটা একটা লাঠি নিয়ে দৌড়ে আসছে—একটী বাড়ি দিয়ে নেলেকে সাবড়ে দেবে; পরিত্রাহি চীৎকার করছে মীর্ণা।

চারপায়ের ক্ষুরের দাপটে কাদা ছিট্‌কে কোথা থেকে গোঁ গোঁ করে শিং উঁচিয়ে দৌড়ে এল নতুন শালিক—নেলোকে উদ্ধার করতে। তার মনের প্রতিজ্ঞা শিং দুটোর তীক্ষ্ণতা দেখেই বুঝতে পারা যায়—টেরিয়ারকে না ফুঁড়ে দিয়ে সে আর ফিরছে না।

নেলোকে ছেড়ে দিয়ে টেরিয়ার সভয়ে দূরে সরে গেল। ড্রাইভার লাঠি নিয়ে নতুন শালিকের পিঠে বসিয়ে দিল ঘা'কতক। নতুন শালিক মার খেয়ে পালিয়ে গেল অন্য দিকে। মীর্ণা রায় এই সংগ্রামের আবর্ত্তের মধ্যে পড়ে আতঙ্কের শক লেগে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল।

নেলো পালিয়ে এসে মাধবী-নিবাসের সিঁড়ির ওপর বসে ধুঁকতে লাগলো। সুধা দেখলো—ওর গলার মাংস গভীর হয়ে ছিঁড়ে গেছে, হয়তো বাঁচবে না।

মীর্ণা রায়ের সত্যি শক লেগেছিল। সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে তখন, সান্নি নুকের তেতালার একটা ঘরে পাখার নীচে বসেছিল মীর্ণা। বুকের দুরুদুরু ভাবটা তখনো সম্পূর্ণ কেটে যায়নি। গেঁয়ো কাকুলিয়া যেন চক্রান্ত করে আজ তাকে আক্রমণ করেছে। জোনাকীগুলি যথেচ্ছা দলে দলে ঘরে এসে ঢুকছে। একটা মশার ঝাঁক আলোর বাল্বটাকে মারমুখো হয়ে ঘিরে ধরেছে। ডানা-ওয়ালা বেঁটে কচ্ছপের মত চেহারা, একটা গুবরে পোকা রুষ্ট গুঞ্জন তুলো, ঝুপ করে মীর্ণার কোলের ওপর পড়ে আক্রোশে ছটফট করতে লাগলো। অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো মীর্ণা।

সকাল বেলা রঘুনাথবাবুকে সান্নি নুকের চাকর খবর দিয়ে গেল—ব্যারামী গরুর দুধ আর চাই না। অবিলম্বে যেন বকেয়া দাম মিটিয়ে নিয়ে চলে যান।

বিকেল বেলা সমিতির জরুরী বৈঠকে সুধা দেখলো—সমিতির নেতা

উপনেতা মোড়ল দালাল সবাই উপস্থিত, শুধু নেই মীর্ণা রায়। অসুস্থ বলেই আসতে পারেনি।

কলকাতার জোয়ান অব আর্ক, সেই মীর্ণা রায়ই কিন্তু প্রস্তাবটা পাঠিয়েছেন ; পেশ করলেন কুমার শিবেন্দ্র। প্রস্তাবের বক্তব্য—সমিতির আন্তর্জাতিক সেবার আদর্শে অনেক বদ্‌জাতির ভেজাল ঢুকতে আরম্ভ করেছে। সভ্যতালিকা পার্জ করা হোক্। সন্দেহভাজনদের নাম রিপোর্ট করতে একটি কমিটি গঠনের আজ্ঞা হয়।

নেতাগোছের লোকগুলিই আগে হাত তুলে সায় দিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সুধার চোখের সামনে থেকে যেন একটা ঝাপ্‌সা পর্দা সরে গেল। দেখা গেল, কতকগুলি হালফ্যাসানের অঘোরপন্থী যেন মনুষ্যত্বের মাংস ছিঁড়ে খাবার জন্য কুৎসিত আগ্রহে হাত তুলে রয়েছে।

সুধাও তাড়াতাড়ি হাত তুলে প্রস্তাবে সায় দিল। সে জানে এখানে এই তার শেষ হাত তোলা।

রিতা

জল নেবার জন্য রিতা ছোট পাহাড়ী নদীটার বালির ওপর এসে দাঁড়ালো।

মাঝ নদীতে বালির ওপর দিয়ে সরু একটা জলস্রোত, ঘড়া ডোবে না। অনেকক্ষণ ধরে হাত দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে একটা গর্ত করলো রিতা। তারপর সেখানে ঘড়া ডুবিয়ে দিয়ে নিজে একটু দূরে নীচের স্রোতের ধারে বসে হাত পা ধুয়ে নিল। মুখটা ভাল করে মেজে নিয়ে আঁচল দিয়ে মুছে উঠে দাঁড়াতেই চোখে পড়লো, দূর মহুয়ার ভীড় অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। একফালি চাঁদ উঠেছে মাথার ওপর। ভরা সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠেছে।

কলসীটা কাঁখে তুলতে আর ইচ্ছে করলো না। কানাটায় হাত দিয়ে হেঁচড়ে কিছু দূর নিয়ে গিয়ে একটা কালো পাথরের চটানে এসে দাঁড়ালো। আজ তার আর কিছু ভালো লাগছে না।

অনেকদিন থেকেই তার ভাল লাগছিল না। সাঁওতাল চাষার মেয়ে রিতা। পাহাড়ের ঢালুতে ছোট একটা ডিহি। এ ডিহিতে যে সাঁওতালদের বসতি তারা তাদের জংলীপনা হারিয়েছে অনেকদিন। কিন্তু চাষ আবাদেও হাত পাকে নি। আইন কানুনকে ভয় খায় বেশী। জংলীদের মত বেপরোয়া মহুয়ার মদ চোলাই করতে পারে না। ট্যাক্স দেয় বেশী, কাপড় চোপড়ের প্রয়োজন বেড়েছে, অথচ আয় নেই। বার মাসে একটা ফসল তাদের ক্ষিধে মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

তাই মাঝে মাঝে কুলি রিক্রুটারের ক্যাম্প বসে। টাণ্ডেলেরা ডিহি

বস্তি ঘুরে ঘুরে জোয়ান খাটিয়ে লোক যোগাড় করে আনে। কিছু আগাম পায়, খাকি কোট আর পাগড়ী পায় বিনা পয়সায়। তিন বছরের কণ্ট্রাক্টে ফিজি দ্বীপে চালান হয়।

রিতা শুধু শুনেছে তার বিয়ে হয়েছে। চাষী সাঁওতালেরা প্রায় হিন্দু হয়ে গেছে। অল্প বয়সেই ছেলে মেয়ের বিয়ে দেয়। লগন মাঝির মেয়ে রিতার বিয়ে হয় মাত্র সাত বছর বয়সে।

তারপর থেকেই রিতা আজ দশ বছর ধরে শুনে আসছে মুনার কথা। বিয়ের কয়েক মাস পরে সেও তিন বছরের কণ্ট্রাক্টে ফিজি চলে গেছে। রিতার শ্বশুর বাড়ীর ভিটের ওপর এখন একটা ধুতুরার জঙ্গল। সে বাপ মায়ের কাছেই থেকেছে আর বড় হয়েছে। দিনের পর দিন শুনে আসছে, মুনা এবার ঘরে ফিরবে। চিঠি এসেছে।

সত্যিই মুনার চিঠি আসে। সে খুব ভাল আছে। কাজের অনেক উন্নতি হয়েছে। পয়সা জমেছে কিছু। সে লেখাপড়াও কিছু কিছু নাকি শিখেছে। সাহেবরা তাকে ভালবাসে। সাহেবরা কত বখশিস্ দেয়, দামী দামী পোষাক বাঁশী টুপি···।

চিঠিতে প্রবাসী পতির এইসব কুশলসংবাদ দিনের পর দিন শুনে আসছে রিতা। লগন মাঝি সমস্ত ডিহি ঘুরে সগর্বে এইসব বার্তা আরও বেশী করে রটিয়ে বেড়ায়। রিতার সৌভাগ্যের কথা সকলে আলোচনা করে।

কৌতূহলের পালা শেষ হয়ে গেছে অনেক দিন। ওসব সংবাদে রিতার আর মন ভরে না। এতদিনে তার আসা উচিত ছিল।

পাথরের চটানে দাঁড়িয়ে রিতার মনে এই চিন্তাই মন্থর কুয়াসার মত ভর করেছিল। আর কতদিন এই ভাবে, এই মনে মনে দেখার একটানা অভিনয় চলবে?

রিতা আবার চলতে সুরু করলো। উঁচু নীচু মেঠো জমি পার হয়ে ডিহির কাছাকাছি পৌঁছেছে। কাঠগোলাপের বনে হালকা ঝড়ের দোলা লেগেছে। কাকের ঝাঁক এসে কলরব ক'রে দেওদারের মাথায় এসে আড্ডা নিচ্ছে। রিতা রাগ করে একটা হোঁচট খেল।

আর একটু দূর এগুতেই দেখা গেল, পথের মাঝে দাঁড়িয়ে মুটু। একথা রিতার জানাই ছিল। শুধু আজ নয়—আজ তিন বছর ধরে মুটু তার পেছনে ঘুর ঘুর করছে।

মুটু বাঁশী বাজিয়ে রিতার নামে গান গায়। উত্তরে রিতা ওকে গালাগালি দেয়। মুটু খরগোস শিকার করে এনে লগন মাঝির বাড়ীতে দিয়ে যায়। ঘরসুদ্ধ লোক মাংস খায়, রিতা ছোঁয় না। মুটু যতবার ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছে, রিতা তাকে বিমুখ করছে।

মুটুর উপদ্রবে রিতার রাগ পড়তো গিয়ে ফিজি প্রবাসী মুনার ওপর। মুটুর এই দুঃসাহস কিকরে সম্ভব হয়? হয় ও জানে মুনা আর আসবে না, নয় মনে করে রিতা বুঝি মুনাকে ভালবাসে না।

মুনাকে ভালবাসে রিতা। কিন্তু মুনাকে তার প্রথম যৌবনের চোখে সে আজও দেখতে পায়নি। মুনা তার কাছে কল্পনা মাত্র। কিন্তু সে কল্পনার মধ্যে রামধনুর মত কত না বিচিত্র মোহ মিশিয়ে আছে। সমস্ত ডিহি যার নামে স্তুতিমুখর, সেই মুনা তার স্বামী। মুনা জোয়ান মরদ, মুনা রোজগার করে, পয়সা জমিয়েছে। যখন দেশে

ফিরবে মুনা, সমস্ত ডিহির দাম যেন বেড়ে যাবে। ভাগ্যিস অনেক্দিন আগেই তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, নইলে বড়ু মাঝির মেয়েই হয়তো মুনার ঘরণী হয়ে যেত। রিতার চেয়ে সে অনেক সুন্দর।

মুটুকে ডিহির লোকে দেখতে পারে না, গরীব বলে নয়, বেজায় কুঁড়ে আর বখা। রিতার ওপর ওর অনুরাগের কথা ডিহির অনেকে টের পেয়েছে। ওকে কড়া কথায় অনেকে শাসিয়েও দিয়েছে—সামলে চল। নিজে ভাল হতে শেখ তবে রিতার মত কত ভাল মেয়ে তোকে বিয়ে করতে চাইবে। তা ছাড়া পরের বউ, অত মাখামাখি ভাল দেখায় না। মুনা মাঝিও শীগগির আসছে। শেষকালে কি ডিহির মধ্যে একটা খুনোখুনি কাণ্ড ঘটাবি।

দূর ফিজির বাগানেও চাঁদ ওঠে। মুনা দেশের কথা ভাবে নিশ্চয়। কিন্তু বেশী করে ভাবে রিতার কথা। চিঠিতে খবর পেয়েছে--রিতা ডাগর হয়েছে, তার ওপর নাকি রাগ-অভিমান করে আর মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলে।

সমস্ত বছরে তিনটে বা চারটে চিঠি পায়। তার মধ্যে শেষ চিঠিগুলিই মুনাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে। রিতা নাকি খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে। তবে বাপ-মার সঙ্গে প্রায়ই কোঁদল করে—মুনা কেন দেশে ফিরছে না।

রিতাকে মনে পড়ে। কিন্তু আট বছর আগে বিয়ের দিনে দেখা রিতার সে-মুখটি আর মনে পড়ে না। হলুদ ছোপানো কাপড় প'রে কাকার কোলে চড়ে বিয়ের আসরে এল রিতা। তারপর পূজোপাট

হয়েছে, মাদল বেজেছে, ঝুমুর হয়েছে, আর অন্য কিছু মনে পড়ে না।

রিতাকে এইভাবে শুধু চিঠির মধ্যেই পেয়ে এসেছে মুনা—আর ছুটির পর বাগান থেকে ঘরে ফিরতে একা পথে কল্পনায় অনেক কিছু পেয়েছে।

মুনা তার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা পরিকল্পনা করে রেখেছে। তাই সে শুধু মুখ বুজে কঠোর পরিশ্রম করে। কিছু পয়সা জমানো চাই। সেই সঙ্গে লেখাপড়া শিখে নিতে হবে। তার পর দেশে ফিরে নিজের সঙ্গিনীকে আবার কাছে টেনে নেবে।

কিন্তু ডিহিতে থাকা আর চলবে না। শহরে ছোট একটা ভাড়া ঘরে সে নতুন সংসার পাতবে। বিনা মাইনেতে এপ্রেন্টিস খেটে বয়লার মিস্ত্রির কাজটা সে ভাল করে শিখেছে। আর জীবনে বাগানের কুলীগিরি নয়।

একটা সিঙ্গল রীডের হারমোনিয়ম কিনেছে মুনা। মাদ্রাজী গান, হিন্দী গান গাইতে শিখেছে। সাহেবদের দেওয়া ট্রাউজার প'রে নাইট ক্যাপ মাথায় দিয়ে মাঝে মাঝে পোর্টেতে সিনেমা দেখে আসে।

মুনার কুলিদের টাণ্ডেল অনেক সময় ঠাট্টা করে বলেছে—কুলি হয়ে এসব কাপ্তেনী ভাল নয় রে ছোঁড়া। দেশে ফিরলে বউ আর চিনতেও পারবে না। ঘরেও নেবে না।

মুনা জানতো দেশে ফিরে আর থাকছে কে? রিতাকেও তারই মতন কায়দাদুরস্ত করে নেবে। তাকে কুলির বউ করে রাখবে না সে। পাহাড়িয়া চাষীজীবনে ফিরে যাবার মত মতিগতি তার আর নেই। কিন্তু এবার বোধ হয় ফেরা উচিত। বেচারী রিতা!

মুনার মনে তার কল্পনার রিতা সমস্ত রূপ নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ডিহির পঞ্চায়েতের বৈঠকে নুটুর সাজার নির্দেশ হয়েছে। দশ টাকা জরিমানা। যেমন করেই হোক, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কে পাথর ভেঙে ওকে দশ টাকা রোজগার করতে হবে আর জরিমানা দিতে হবে। নইলে এ ডিহিতে ওর স্থান নেই।

নুটু বললো—আমি রিতার কাছে মাপ চেয়ে নিচ্ছি। ও ক্ষমা করে দিক্। জরিমানা যেন না করা হয়। গাঁয়ের বাইরে তাড়িয়ে দিলে আমি মরে যাব।

কিন্তু অপরাধ বড় কঠিন। সহজে মুক্তি দেওয়া যায় না। নোংরা চেহারা, কাজে কুঁড়ে, নুটুর জংলী স্বভাব আজও গেল না। উপোষেও ওর পাথুরে শরীর যেন কাবু হয় না। দিন গেলে দুটো কাঠবিড়ালী মেরে পুড়িয়ে খেয়ে নিলেই ওর চলে গেল। চুলের ঝুঁটিতে সর্বদা বাঁশী গুঁজে রাখে। সকলে যখন মাঠে খাটতে বের হয় নুটু তখন একটা আলের ওপর শুয়ে বাঁশী বাজায়।

এ-সব অপরাধ ক্ষমার্হ। কিন্তু পরের বিয়ে-করা বউয়ের পেছনে একটা উপদ্রবের মত লেগে থাকা, কোন পঞ্চায়েত ক্ষমা করতে পারেনা।

রিতা সেদিন স্রোতে স্নান করতে গিয়েছিল। বনের নিরালায় নিশ্চিন্ত মনে যখন সে স্নান করছে, একটা কুলের ঝোপ থেকে এক ঝাঁক তিতির উড়ে পালিয়ে গেল, যেন ভয় পেয়ে। রিতার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তখুনি ধরে ফেললো অপরাধীকে। ঝোপের ভেতর নুটুর ঝাঁকড়া চুলের মাথা দেখা যাচ্ছে।

ঘরে ফিরে এসেই রিতা লগন মাঝিকে সে কথা জানিয়ে দিয়েছে।

এই অপরাধেই নুটুর শাস্তি। নুটু হাতজোড় করে পঞ্চায়েতের কাছে নিবেদন করলো—আমি রিতাকে বহিন বলে মাপ চেয়ে নিচ্ছি। ও ক্ষমা করে দিক্।

রিতা বললো—না।

নুটু ডিহি ছেড়ে চলে গেছে। রিতা তার ঔদ্ধত্যকে মাপ করতে পারে নি, এর জন্য রিতার মনেও কোন আপশোষ নেই। নুটুর এই অপরাধ, এই আবদার, অনেকটা বামন হয়ে চাঁদ ধরার সখের মত। তার স্বামী মুনার কথাও তো নুটু সবই শুনেছে। তবে কেন সে প্রতিযোগিতায় নামে, কোন্ সাহসে ?

চিঠিও এসে গেল, মুনা আসছে। আগামী সপ্তাহে ওদের জাহাজ ছাড়বে।

রিতার বুক দুরদুর করে উঠলো। এ-কী অদ্ভুত চাঞ্চল্য। মুনা আসছে। ফিজি দ্বীপের চাঁদ নীল আসমানে ভেসে এসে এই মহুয়ার মাথায় এসে দাঁড়াবে।

জঙ্গল থেকে কোচড় ভরে রিঠা ফল কুড়িয়ে এনে ঘরে রাখলো রিতা। মোটা মুঙ্গার মালা একটা ধুয়ে রাখলো।

খিদিরপুর থেকে চিঠি এসে গেছে। জাহাজ পৌঁছে গেছে। মুনা তিন দিন পরে পৌঁছচ্ছে দেশে।

ডিহির সব মাঝিরা রাত থাকতে স্টেশনে এসে বসে রইল।

ভোরে কলকাতার ট্রেন থামে। লগন মাঝি একটা পাল্কী খুঁজছিল, কিন্তু ভাড়া বেশী বলে আর জোগাড় হলো না।

ট্রেন থেকে একদল কুলি নামলো। নানা গাঁ ও ডিহি থেকে কুলিদের মা বউ ও ছেলে-মেয়েরা এসেছে। বুড়ীরা তাদের ছেলেদের কাঁধে মুখ রেখে একচোট কেঁদে নিল। যাদের ছেলেরা আসেনি তারাও কাঁদলো। সোরগোল শেষ হবার পর নানা দিকের পথে মাঠে জঙ্গলে যে যার ঘরে চললো।

আর নামলো মুনা। কালো ফুল প্যাণ্ট পরা, গায়ে কোট আর কম্ফোটার জড়ানো। পায়ে জুতো আর মোজা। বিবর্ণ একটা পুরানো ফেল্টের টুপি মাথায়। মোটা বর্মা চুরুট হাতে।

মাঝিরা হাঁ করে বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলো। মুনা লগন মাঝির কাছে এগিয়ে এসে হাঁটুতে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই সকলের জড়তা যেন একটু ভাঙলো। বুড়ো মাঝিদের দু'একজন মুখ ফুটে সাহস করে কুশল প্রশ্ন করলো।

তারপর ডিহির পথ। মুনা আগে আগে চলেছে। মাঝিরা সকলে পেছনে দল বেঁধে চলেছে। সাড়া শব্দ বড় কিছু নেই। মুনা এক একবার থেমে তাদের সঙ্গ নিলেও তারা যেন থেকে থেকে পিছিয়ে পড়ছে।

কথা ছিল মুনা ডিহিতে ঢোকা মাত্র ছেলেরা মাদল বাজাবে। তারপর তো সমস্ত দিনের উৎসব লাগবে। লগন মাঝি একটা পাঁটা কিনে রেখেছে।

রিতা তার মায়ের নির্দেশ মত সাজ করেছে। ভয়ে বুক কেঁপেছে,

লজ্জা করেছে, তবুও। নিজেকে জোর করে শান্ত করে আনে রিতা। বেশী লজ্জা করে প্রথম দেখার সব আনন্দটুকু যেন নষ্ট না হয়। সে হয়তো রাগ করবে।

বটতলার নীচে লোকজনের গলার শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। কিন্তু ছেলেদের মাদল বাজলো না। রিতা কৌতূহলী হয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

লগন মাঝি আর সঙ্গে আরও দু'তিনজন মাঝি ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে অদ্ভূত ইংরাজী পোষাকে একজন লোক। রিতা অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। এরা মুনার খবর নিয়ে আসছে। মুনা হয়তো তুলসী মাঝির গোলায় বিশ্রাম করছে।

লগন মাঝিরা রিতার সামনে এসে দাঁড়ালো। রিতা বোকার মত তবু দাঁড়িয়ে আছে দেখে একজন মাঝি চোখ টিপে ইসারায় জানালো—ঘরের ভেতর যা।

রিতা তবু দাঁড়িয়েছিল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে নি। লগন মাঝি আবার মুখের ইসারায় জানিয়ে দিল—মুনা।

এক দৌড়ে ঘরের ভেতর ঢুকে রিতা থরথর করে কাঁপতে লাগলো। ওর মা এসে ধরে দু'বার ঝাঁকুনি দিল—ও কি হচ্ছে?

সমস্ত ডিহিটা স্তব্ধ হয়ে গেছে। মুনা ফিরেছে, ডিহির ছেলে মুনা। কিন্তু আমোদ তো জমলো না। ছোট ছেলেরা দেয়ালে মাদল ঝুলিয়ে রাখলো। পাহাড়ের ওপারে গির্জার একটা দেশী সাহেব আজ তাদের ডিহিতে ঢুকেছে, ভয় দেখাবার জন্য।

আটহাতি খেরো কাপড়ে রিঠে মাজা শরীর জড়ানো, শালবনের জংলী চাষীর মেয়ে রিতা। চোখে জল দেখা দেবার আগেই মাকে বললো—ছেড়ে দাও আমি ঠিক আছি।

তবু চোখের জলের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য আর একটা কল্পনার ছবি চক্‌চক্‌ করে উঠলো।—ডিহি ছাড়িয়ে বহু দূরে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কের পাশে রোদের মধ্যে বসে জংলী নুটু একা পাথর ভাঙছে। ওর পাশে ঝুড়ি হাতে সে যদি গিয়ে একবার দাঁড়াতো, খারাপ কিছু বোধ হয় হতো না।

ভাট তিলক রায়

ভাট তিলক রায়ের কথা আমরা এখনো ভুলে যাইনি। তাকে আমরা ভাল করে চিনতাম, তার মুখে অনেক গান শুনেছি। মাঝে কিছুদিন সে বহুরূপীর পেশা ধরেছিল। সেসময়ের একটা ঘটনা আজও মনে পড়ে। গয়লানী সেজে তিলক রায় ব্রজবাবুর বাড়ীর বারান্দায় এক হাঁড়ি দই নিয়ে এসে বসেছিল, আমরা পাড়ার ছেলেরা সবাই মিলে জটলা করে সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের কৌতূহলের সীমা ছিল না। ব্রজবাবুর মত গম্ভীর রাশভারী মানুষের কাছে এত বড় একটা ফষ্টি নিয়ে তিলক রায় কোন্ সাহসে এসে দাঁড়িয়েছে? কিন্তু ব্রজবাবু গম্ভীরভাবে দরদস্তুর করলেন, দই চেখে দেখলেন, তারপর এক সের দই কিনলেন। দামটা হাতে নিয়েই সেই কৃত্রিম গয়লানী এক টানে তার মাথার পরচুলা আর নাকের নথ ফেলে দিয়ে তিলক রায়ের মূর্ত্তিতে দেখা দিল। হাত পেতে বক্‌শিস চাইলো। ব্রজবাবু হতভম্বের মত খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর একটা প্রচণ্ড খুসীর উচ্ছ্বাসে তাঁর জমাট গাম্ভীর্য্য ধূলো হয়ে উড়ে গেল। একটি দশ টাকার নোট তিলক রায়ের হাতে ফেলে দিলেন।

বিষুয়া পরবের সময় ভাট তিলক রায় গেরুয়া পাগড়ী প'রে কালীবাড়ীর চত্বরে এসে বসতো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু ছড়া কেটে আর গান গেয়ে পার করে দিত তিলক। গানের ভাষাটাও ছিল অদ্ভুত—না ভাখা, না ঠেট হিন্দী, না খাড়ি বোলি, না বাংলা, না মগহি। মনে হতো ঐ সব ভাষা মিলিয়ে যেন তিলক নিজস্ব একটা

ভাষা তৈরী করে নিয়েছে। তার মধ্যে মাঝে মাঝে দু'একটা মুণ্ডারী কুরুম্ কারুম'ও থাকতো। আজ তিলক রায় বেঁচে থাকলে তার কাছে ভাষাতত্ত্বের গবেষণা করার মত একটা উপাদান পাওয়া যেত। এমনও হতে পারে, তিলক রায়ই আমাদের দেশের সেই অখ্যাত মনস্বী, যে প্রথম এই বহুবচনাবৃত ভারতের উপযোগী একটি এস্পারান্টো তৈরী করেছিল, কিন্তু কেউ জানতে পারলো না। তিলক যখন মাঝে মাঝে কাঁচা হিন্দী ও বাংলা মিলিয়ে তার গাথাগুলির ভাষ্য করে আমাদের বোঝাতো, তখন আমরা সবই বুঝতে পারতাম আর মুগ্ধ হয়ে যেতাম।

ভাট তিলক রায়ের গানের মধ্যে কী না ছিল? বুনডুটুক্‌কুরু গুহার রাজার ছেলে মুলুটুংলা এক হরিণীর প্রেমে পড়ে সারা অরণ্য ঢুঁড়ে ফিরছে—চোখে ঘুম নেই, মুখে জল নেই। দুর্ব্বা ঘাসের পোষাক গায়ে দিয়ে নদীর ধারে চুপ করে শুয়ে থাকে—যদি ভুলে ভুলে সেই ছলনাসুন্দরী হরিণী একবার কাছে চলে আসে। রাজা হাতীর দাঁতের কুড়ুল নিয়ে সদল-বলে বের হয়েছেন। হয় সেই হরিণী, নয় এই উদ্‌ভ্রান্ত কুপুত্র—দু'জনের একজনকে পেলেই হবে—নিজের হাতে সংহার না করে তিনি আর শান্ত হবেন না।

ভাট তিলক রায়ের গানের এই রূপকথার আস্বাদ আমাদের তখন কিছুক্ষণের জন্য যেন হতবুদ্ধি করে দিত। তিলকের গানের সেই চরম অবাস্তব কত সত্য বলে মনে হতো। তার মধ্যে ভেবে দেখবার মত কোন প্রশ্নই থাকতো না। তিলকের গান আর ছড়ার প্রতিটী পদের সঙ্গে আমাদের বিস্ময় এক ইন্দ্রজালের জঙ্গলে দিশেহারা

হয়ে ঘুরে বেড়াতো। আমরাও যেন মনে মনে ঘাসের পোষাক প'রে সঙ্গে সঙ্গে নিঝুম হয়ে শুয়ে থাকতাম, কতক্ষণে সেই হরিণী এসে পৌঁছয়। বুন্-ডুটুক্-কুরু—কথাগুলি এক একটি টোকা দিয়ে আমাদের বোধরাজ্যের কুয়াসার মধ্যে ছোট ছোট এক একটী সূর্য্য জ্বালিয়ে দিত।

আজ বড় হয়ে ভাট তিলক রায়ের রূপকথার একটা অর্থ বুঝতে পারি। বিস্ময় আরও বেড়ে যায়। তিলক রায় কি সেই প্রাগৈতিহাসিক বেদের শ্রুতিধর? যখন মানুষ আর পশু একই অরণ্যের জঠরে প্রতিবেশীর মত থাকতো? তিলক কি সেই পুরাকল্পের মানুষের সংসারে প্রথম বিজাতীয় প্রণয়ের কাহিনীটি শুনিয়েছিল? বুন্‌ডুটুক্‌কুরু গুহার যুবরাজ মুলুটুংলা কি সেযুগের ওথেলো আর সেই শৃঙ্গবতী হরিণী কি তার ডেসডেমোনা? আজ অবশ্য অনেক মাথা ঘামিয়ে—এথ্‌নোলজী আর সাইকো-এনালিসিসের প্রয়োগ বিয়োগ করে এই তত্ত্বটা বুঝে খুসী হচ্ছি। কিন্তু প্রথম যখন শুনেছিলাম, তখন ভাট তিলক রায় ছিল হ্যামলিনের বাঁশীওয়ালা আর আমরা ছিলাম ছেলের দল।

আমাদের মুগ্ধাবস্থা হঠাৎ চম্‌কে উঠতো। তিলক অন্য একটা গাথা গাইতে সুরু করে দিত। এটা আবার একেবারে অন্য ধরণের। এই গাথার কথা কাহিনী ও সুরে সেই নিশির ডাকের মত আহ্বান ছিল না। কথাগুলি আমাদের হাতে হাতে যেন এক একটি তলোয়ার ধরিয়ে দিত।—কার্ণাইল ডালটন সাহেবের পল্টন পালামৌ কেল্লা ঘিরে ধরছে। মুহুর্মুহু তোপ পড়ছে। ফটকের মুখে রক্তের ফোয়ারা ছুটছে। এক একটা শওয়ারের দল ঝাঁপিয়ে পড়ছে ফটকের ওপর। কালো কালো কোল তীরন্দাজ আর তলোয়ারবাজ রাজপুতেরা দলে দলে

ফটকের মুখে রুখে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ হটবে না। খাড়া দাঁড়িয়ে লড়ছে আর মরছে।

মিউটিনির সর্দ্দার রাজার খুড়ো। থুড়থুড়ো বুড়ো। ফটক সামলাতে যখন আর কেউ নেই, কার্ণাইল ডাণ্টন যখন পণ্টন নিয়ে কেল্লায় ঢুকতে চলেছে, ঠিক সেই সময় সমস্ত কেল্লাটা যেন শেষ বারের মত হুঙ্কার ছাড়লো। দেখা গেল, এক আশী বছরের লোলচর্ম বুড়ো রাজপুত তার মাথার পাগড়ীটাকে ঢালের মত এক হাতে তুলে, আর এক হাতে তলোয়ার ঘুরিয়ে মত্তসিংহের মত যেন কেশর ফুলিয়ে, নাচতে নাচতে, হুঙ্কার দিয়ে, সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্ষণিকের জন্য যেন একটা মৃত্যুর হোলি খেলে নিয়ে রাজার খুড়ো, থুড়থুড়ো বুড়ো, সেইখানে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে লুটিয়ে রইল।

ভাট তিলক রায় মারা গেছে অনেকদিন। আজ মনে হচ্ছে, তার সঙ্গে যেন ইতিহাসের প্রেতাত্মাটী সরে গেছে। যুগে যুগে কত ঘটনা দেখা দিয়েছে, শেষ হয়ে গেছে। আধুনিক মানুষ আমরা, ইতিহাসের জীব হয়েও আমরা তার খপ্পরে থাকি না। আমরা বদ্‌লে যাই। আজ যে-ব্যথায় আমরা কাঁদছি, কাল তা শুধু স্মৃতি হয়ে যায়, পরশু সেই স্মৃতি হয়তো আমাদের শুধু হাসাতে থাকে।

কিন্তু ভাট তিলক ছিল যেন এক নিদ্রাহীন যখ। অতীতের যত পাপ তাপ, আনন্দ বিষাদ, প্রেম প্রণয় ও লজ্জা, শত্রুতা প্রতিহিংসা ও প্রতিজ্ঞাকে সতর্ক পাহারায় সে আগ্‌লে ছিল। যা বিস্মরণীয়, তাকে সে ভুলতে দেয়নি। যা ক্ষমার্হ, আজও সে তাকে ক্ষমার যোগ্য

হতে দেয়নি। যে গ্লানি আমরা ভুলে গেছি, সেই গ্লানিকে তিলক বাঁচিয়ে রেখেছিল। সেই কবেকার সভ্যতার হরিণীপ্রেমবিধুর বনবাসের লজ্জা আর এই সেদিনের কর্ণেল ডাল্টনের হাতে রাজপুত বিদ্রোহীর চরম শাস্তির জ্বালা—তিলক রায় এক মৃত যুগের শবাধার থেকে প্রেতের মত উঁকি দিয়ে সেকথা স্মরণ করিয়ে দিত।

আমরা আর একটু বড় হয়েছি তখন, শুনতে পেলাম তিলক রায় সহর ছেড়ে দেশে চলে গেছে। আমরা শুনেছিলাম লাল্‌কি নদীর ওপর একটা প্রকাণ্ড বাঁধ তৈরী হচ্ছে, নিমিয়াঘাটের কাছে। তিলক রায়ের বাড়ী নিমিয়াঘাট থেকে কিছু দূরে। টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে গেলে মাত্র আধ ঘণ্টার সফর।

কলকাতার একটা কোম্পানী, জ্যাকব এণ্ড জ্যাকব, সেই বাঁধটার কণ্ট্রাক্ট নিয়েছে। জায়গাটার জরিপ হয়ে গেছে। মালপত্র আসছে, কুলি কারিগর আর ইঞ্জিনিয়ারেরা আসছে। তিলক রায়ের মনের মধ্যে সজীব ইতিহাসের প্রেতটা বোধ হয় সতর্ক হয়ে উঠলো। বহুরূপীর পেশা ছেড়ে দিল তিলক। সহরে ছড়া গাইতে আর আসে না। নিমিয়াঘাটের আশে পাশে যত গাঁ আছে, সব জনপদের কানে কানে তিলক এক সাবধান বাণী শুনিয়ে বেড়াতে লাগলো।—ভয়ঙ্কর একটা অমঙ্গল আসছে, সময় থাকতে একটা বিহিত ব্যবস্থা করা চাই। লাল্‌কি নদীর বাঁধ তৈরী করতে যারা এসেছে, তাদের উদ্দেশ্য কি? বাঁধ তৈরী এমনিতেই হয়? লাল্‌কি নদীর ঢল সাম্‌লাবে সিমেণ্ট আর লোহার কয়েকটা দরজা? কেউ বিশ্বাস করো না। একশোটি নরবলি না দিলে লাল্‌কি নদী কখনই তুষ্ট হবে না। ছেলেধরার দল ঘুরছে,

বাঁধ কোম্পানী টাকার লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যাবে। তারপর একদিন মাঝরাত্রে হাত পা বেঁধে বলি দিয়ে লাল্‌কি নদীর জলে ভাসিয়ে দেবে। ঐ যে একটা নতুন থাম তৈরী করেছে, ঐখানেই বলি দেওয়া হয়। বলির আগে আফিং খাইয়ে দেয়, কেউ বুঝতেও পারে না কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কি পরিণাম হবে।

নতুন নতুন ছড়া বেঁধে তিলক রায় তার বাণী প্রচার করে বেড়াতে লাগলো।—ইঞ্জিন এসেছে, কত রকমের কলকব্জা আসছে। কিন্তু কী সাধ্য আছে তাদের লাল্‌কি নদীর ঢল বেঁধে দেবে? আগে নরবলি হবে, তবেই কল চলবে। তা ছাড়া আর কোন পথ নেই। অতএব, সব গাঁয়ের মানুষ হুঁসিয়ার হয়ে যাও। কেউ কুলির খাতায় নাম লিখিও না, সোনার মোহর মজুরী দিলেও না।

এসব খবর আমরা তিলকের মুখেই শুনেছিলাম। বিষুয়া পরবের দিন একবার সহরে আসতো তিলক। তিলকের চেহারাটাও কেমন পাগ্‌লা গোছের হয়ে গিয়েছিল। চোখের দৃষ্টিটাও একটা সংশয়ে উদ্বেল হয়ে থাকতো। চুপি চুপি বলতো—ভয়ানক কাণ্ড হচ্ছে খোকাবাবু। নিমিয়াঘাটে লাল্‌কি নদীর বাঁধ তৈরী হচ্ছে। কখন যে গরীবের প্রাণটা চলে যায় ঠিক নেই!

আমরা বলতাম।—কেন?

তিলক।—এক একটি থাম উঠছে, আর পাঁচটা মানুষের প্রাণ যাচ্ছে।

আমরা।—কেন?

তিলক।—নরবলি দিতে হচ্ছে, নইলে মাটিতে থাম ধরবে কেন? লাল্‌কি নদীর রাগ কি এমনিতেই শান্ত হবে?

তিলক একটা ছড়া গেয়ে শোনালো। এই গাথা সে কোন উত্তরাধিকার হিসাবে পায়নি, এটা তার নিজেরই রচনা। তিলক রায়ের গাথার ঝুলিতে যুগ যুগান্তের ক্ষোভ সঞ্চিত হয়ে আছে। এইবার নতুন একটা ক্ষোভ তার সঙ্গে যোগ হলো।

আমরা গল্প শুনেছিলাম, গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইন যখন নতুন তৈরী হয়, তখন কিছুদিন হাতীর উপদ্রবে ট্র্যাফিক ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। হাতীরা তাদের জঙ্গলে এই কলকব্জার অনধিকার প্রবেশ ভাল মনে গ্রহণ করেনি। তারা দল বেঁধে লাইনের ওপর বসে সত্যাগ্রহ করতো, কখনো বা এসে শুঁড় দিয়ে লাইন উপড়ে ফেলে দিত—সাবোতাজ করতো।

তিলক ভাট যখন তার সেই বড় বড় চোখ কুঁচ্‌কে একবার আমাদের দিকে তাকিয়ে চলে গেল, তখন আমাদের এই হাতীদের রাগের গল্পটা একবার মনে পড়েছিল! তিলক ভাটের চোখে যেন সেইরকম একটা আক্রোশ।

তার কিছুদিন পরে আমরা শুনে শিউরে উঠলাম, নিমিয়াঘাটের কাছে কোন্ একটা গাঁয়ে তিনটে ছেলে-ধরাকে টাঙি দিয়ে কুপিয়ে কা'রা মেরে ফেলেছে। সহর থেকে একটা পুলিশ ফৌজ নিয়ে এস-পি সেইদিনই নিমিয়াঘাট রওনা হয়ে গেলেন।

তাঁর দু'দিন পরে শুনলাম—ছেলেধরা নয়, তিনটে কুলি রিক্রুটারকে মেরেছে। কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করে সদরে আনা হয়েছে। আমাদের অনেকেরই কেমন একটা বিশ্বাস ও আশঙ্কা ছিল—এই প্রতিহিংসার ষড়যন্ত্রে তিলক রায়ও থাকতে পারে। তাই স্কুল থেকে পালিয়ে আমরা

সেসন জজের আদালতের ভীড়ের মধ্যে এসে ভিড়ে পড়তাম। উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখতাম, আসামীদের মধ্যে তিলক আছে কি না। না, তিলক রায় নেই। চার পাঁচজন গাঁয়ের লোক তারা, তাদের কাউকে আমরা চিনি না।

তিলক রায়কে আসামীদের মধ্যে দেখতে না পেয়ে আমাদের একটা উদ্বেগ শান্ত হতো, একটু খুসী হতাম। কিন্তু ঘটনাটা আবার একটু কেমন পান্‌সে হয়ে যেত আমাদের কাছে। এর মধ্যে তিলক রায় থাকলেই যেন ভাল হতো। হিরো হিসাবে তিলক রায় কিছুক্ষণের জন্য আমাদের কাছে একটু খাটো হয়ে যেত।

আরও বড় হয়েছি। তিলক রায়কে আরও কয়েকবার দেখেছি। তখন লাল্‌কি নদীর বাঁধ রচনার মধ্যপর্ব আরম্ভ হয়েছে। বড় মামার সঙ্গে নিমিয়াঘাটের অফিস কোয়ার্টারে থাকি। সারা দিন ঘুরে ফিরে বাঁধের কাজ দেখতাম। স্মৃতি থেকে সেদিনের অনুভবের কিছুটা, আর আজকের বিচার দিয়ে তার পরিশিষ্টের কিছুটা বলতে পারা যায়।

তিলক রায়ের বাণী ব্যর্থ হয়নি। নিমিয়াঘাটের কাছাকাছি কোন গাঁ থেকে কোন কুলি তখনো এই বাঁধের কাজে খাটতে আসেনি। লাল্‌কি নদীর বাঁধ তখনো তাদের কাছে শত্রু হয়ে আছে। কিন্তু তিলক রায় আসে মাঝে মাঝে। গুপ্তচরের মত যেন সে ছদ্মবেশে বাঁধের কীর্ত্তি দেখে যায়। দেশী মজুর কেউ নেই, সবই ছত্রিশগড় থেকে এসেছে। কেরাণীরা সবাই বাঙালী। ইঞ্জিনিয়ারেরা বেশীর ভাগ সাহেব। মিস্ত্রী আছে সব জাতের লোক—পাঞ্জাবী পাঠান আর চাটগেঁয়ে। তিলক

রায় সবারই সঙ্গে খাতির জমায়, নানা রকম প্রশ্ন করে। তার সন্দেহ দূর হয় কি না বোঝা যায় না। এমনি করেই মাঝে মাঝে হঠাৎ দেখা দেয় তিলক—তারপর আবার চলে যায়।

আমাকে একদিন দেখতে পেয়ে চিনতে পারলো তিলক। তিলক খুসী হয়ে ও আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো।—আপনি এখানে কেন দাদাবাবু?

—বড় মামা এখানে আছে যে।

—আপনার বড় মামা? তিলক চিন্তিত ভাবে তার স্মৃতি হাতড়ে বড় মামার পরিচয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করলো।

আমিই সাহায্য করলাম।—লালকুঠির জিতেনবাবুকে মনে নেই, তিনিই আমার বড়মামা।

তিলক খুসী হয়ে উঠলো।—ওঃ হো, চিনতে পেরেছি। চলুন দাদাবাবু, তাঁকে একটা আদাব জানিয়ে আসি।

বড় মামাকে অভিবাদন জানিয়ে তিলক রায় মেজের ওপর বসে পড়লো। তারপর বললো—একটা কথা আমার মত বোকাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন বড়বাবু, এই বাঁধ তৈরী হয়ে কি হবে? কারও কোন ভাল হবে কি?

উত্তরে বড় মামা যা বললেন, তা'তে তিলক শুধু হাঁ করে রইল, যেন গিলতে পারছে না কিছু।—বলিস্ কি তিলক? দশ বছর পরে নিমিয়াঘাটকে আর চিনতে পারবি? এখান থেকে চারটে পাকা সড়ক বের হবে—চোস্ত ম্যাকাডাম করা সড়ক। মীটার গেজ রেল লাইন বসবে। দক্ষিণে এরই মধ্যে সিমেন্টের কারখানা খোলার বন্দোবস্ত সুরু হয়ে গেছে। বাঁধটা একবার শেষ হয়ে নিক্ তো, তখন বিরাট একটা

পাওয়ার স্টেশন হবে এখানে। তিনটে জেনারেটর বসবে, সঙ্গে এক জোড়া টার্বাইন। ছে'যট্টি গাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ ছুটে যাবে এখান থেকে দশ মাইল পর্য্যন্ত—ডবল সার্কিট ট্রাঙ্ক লাইন ধরে।

বড় মামার কথার মধ্যে ভবিষ্যতের এক সুখী ও সম্পন্ন উপনিবেশের বিচিত্র মূর্ত্তি ফুটে উঠছিল। তিনি আরও জাঁকালো করে শুনিয়ে দিলেন।—কত কারখানা খুলে যাবে দেখবি। বাঁশের জঙ্গল পড়ে রয়েছে, কাগজের মিল বসবে। একটা কাঁচের কারখানা খুলবে—এই যে পড়ে রয়েছে টন টন সাদা বেলেপাথরের ধূলো, এসব তখন গ'লে গিয়ে স্ফটিক হয়ে যাবে রে তিলক।

আমরা ছেলেবেলায় যেভাবে সম্মোহিতের মত তিলক রায়ের গান শুনতাম, তিলক নিজেই আজ যেন সেইরকম একটা কিশোর কৌতূহলে মুগ্ধ হয়ে বড় মামার কথাগুলি শুনছিল। মনে হচ্ছিল, বড় মামাই একজন ভাট, তিলক একজন শ্রোতা মাত্র। আধুনিক যুগের এক ভাটের মুখে ভবিষ্যতের কথা শুনছে স্বয়ং তিলক। তবুও তিলকের মুখে একটা বেদনার্ত্ত ছায়া পড়েছিল যেন। ইতিহাসের প্রেতটা যেন ভবিষ্যতের এই ঔদ্ধত্য দেখে মনের দুঃখে মুসড়ে পড়ছে। তিলক চলে গেল।

তিলক আবার একদিন এল। জ্যাকব এণ্ড জ্যাকবের নিমিয়াঘাট বারেজ কনস্ট্রাকশনের একটা প্রস্পেক্টাস হাতে নিয়ে বড় মামা তিলক রায়কে নানা তথ্য পড়ে পড়ে শোনালেন। তিলক কি বুঝলো তা সেই জানে। বড় মামা পড়ছিলেন নিজের আগ্রহের আবেগে; নিজেকে উৎফুল্ল করার জন্যই যেন তিনি নতুন ধরণের একটি লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়ছিলেন। কারণ আছে, বড় মামা কিছু শেয়ার কিনেছেন।

আজ তিলককে দেখে কেমন একটু শান্ত মনে হলো। সমস্ত শক্তি দিয়ে তার সব রোষ সংযত করে লাল্‌কি নদীর বাঁধকে যেন সে একটু সুনজরে দেখবার চেষ্টা করছে।

তারপরেই একদিন তিলক রায় এল। সেদিন সে আর একা নয়। শত চারেক গাঁয়ের কুর্মি আর জোলা তার সঙ্গে এসেছে। সবাই সুবাধ্য ছেলের মত কুলি আফিসের সামনে দাঁড়িয়ে নাম লেখালো; নম্বরের চাক্‌তি আর কোদাল হাতে নিয়ে দল বেঁধে নতুন একটা মাটির ধাওড়াতে গিয়ে সবাই উঠলো। আগামী কাল থেকেই ওদের কাজ সুরু হবে। শুধু আজকের দিনটা ওরা জিরিয়ে নিচ্ছে। শুক্‌নো পাতা পুড়িয়ে বড় বড় হাঁড়িতে ভাত ফুটিয়ে ওরা খেল। তখনো ওদের মনের সন্দিগ্ধ ভাবটা বোধ হয় একেবারে কেটে যায়নি। এই নতুন ঘরের সুখ আজ ওরা অস্বীকার করতে পারছে না; তবু চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রশ্ন যেন ঘনিয়ে আছে—এই সুখ সইবে তো?

•

লাল্‌কি নদীর বাঁধটা সত্যিই একটা কীর্ত্তি। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতাম—উঁচু উঁচু ক্রেনগুলির মাথার ওপর রোদ পড়েছে। যেন বিশ্বকর্ম্মার কিরীট। ছোট ছোট ক্রেনগুলি নিতান্ত অবলীলায় ছোঁ মেরে এক একটা কংক্রীটের শ্ল্যাব তুলে নিচ্ছে—পর মুহূর্ত্তে ঘাড় ফিরিয়ে বসিয়ে দিচ্ছে লাইনের ওপর স্তরে স্তরে। একটা প্যাডেল টাগ, একটা ড্রেজার আর একটা এক্সক্যাভেটার নদীর ওপর পড়ে উৎখাতকেলির আনন্দে অস্থির। হাজার টন জল মাটী আর পাথর উপড়ে ফেলছে। ডবল সিলিণ্ডার

ডিজেল ইঞ্জিনগুলি যেন দর্পভরে আত্মহারা। পিনিয়নগুলির মুখে একটা শাণিত দন্তর হাসি। সমস্ত যন্ত্রযূথ যেন হাসছে।

ইঞ্জিনিয়ার ওভার্সিয়ার আর সার্ভেয়ারের সংখ্যাই হবে একশোর ওপর। তাছাড়া ফিটার, টার্ণার, লেদমিস্ত্রী, ওস্তাগর, বয়লারম্যান, ইঞ্জিন ড্রাইভার আর কুলিমজুর সব নিয়ে হবে হাজারের ওপর। দূর ছত্রিশগড় থেকে এসেছে রোগা রোগা পুরুষ কুলি আর বেঁটে মজবুত চেহারার মেয়ে কুলি।

নিমিয়াঘাটের এই বেলে মাটীর তেপান্তরে লাল্‌কি নদীর ধারে এক বিরাট বাহিনী যেন এসে ছাউনী ফেলেছে। প্রতিদিন ভোর থেকেই সাজ সাজ রব পড়ে যায়। পরেশনাথের ডাকবাংলাতে বসে নীচের দিকে তাকালে এই কুয়াশায় ঢাকা জনপদ অল্প অল্প দেখা যায়—নিঃশব্দ ষড়যন্ত্রের মত যেন গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে; কার বিরুদ্ধে যেন সংগ্রাম ঘোষণা করেছে।

সত্যি কথা, এ'ও এক সংগ্রাম, জল পাথর আর মাটীর জড়ত্বের বিরুদ্ধে। লাল্‌কি নদীর চওড়া খাত ধরে প্রতি মুহূর্ত্তে এক বেগময় সলিলসম্ভার গড়িয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার পাশেই বসে শুক্‌নো নিমিয়াঘাট যেন তৃষ্ণায় ধুঁকছে। সারা দুপুর ধরে এক নিদারুণ প্রদাহে চিক্‌ চিক্‌ করে পুড়তে থাকে নিমিয়াঘাটের বেলে মাটীর পরমাণু। কত শত বছর পার হয়ে গেছে কে জানে, শ্যাম বনভূমির শেষ অঙ্কুরটী এইখানে জল বাতাসের অনুদার চক্রান্তে মরে গেছে।

মানুষের বুদ্ধি আজ বুঝতে পেরেছে—আবাদ করলে ফলতো সোনা।

নিমিয়াঘাটকে আর পতিত করে রাখা উচিত নয়। লাল্‌কি নদীর খামখেয়াল শান্ত করে দিতে হবে—এক হাজার ফুট লম্বা এক সুকঠিন কংক্রীটের বাঁধ দিয়ে। পনেরটী খিলান করা স্প্যান, প্রত্যেকটির সঙ্গে পঞ্চাশ টনের গেট ফিট করতে হবে। মৌশুমী বৃষ্টি এই লাল্‌কি নদীকে প্রতি বছর ফাঁপিয়ে তোলে, ফাল্গুনে হাজার মাইল দূরের হিমগিরির বরফগলা জল গড়িয়ে আসে; কিন্তু সবই বৃথা হয়। এক অন্ধ বেগ সব জলভার লুটে নিয়ে চলে যায়, নিমিয়াঘাটের ডাঙ্গা তার এক কণা প্রসাদ পায় না। তাই গড়ে উঠছে বাঁধ—আট কোটী টাকার স্কীম। দেশ বিদেশের মহাজনেরা সাত দিনে সাগ্রহে সব ডিবেঞ্চার লুটে নিয়ে গেছে।

এখান থেকে উত্তরে ও দক্ষিণে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, কম করে, সাতটা খাল। জরিপ করা হয়ে গেছে। ভূস্তর ফুটো করে অন্তঃসলিলের রহস্য জানা হয়ে গেছে। এই খাল দিয়ে লাল্‌কি নদীর জলভার চলে যাবে দিকে দিকে—উর্ব্বরতার অর্ঘ্য নিয়ে। রুক্ষ নিমিয়াঘাট সবুজ হয়ে উঠবে। তাই মনে হয়, সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যেন এক সুমহিম সংগ্রামের আয়োজনে, এক সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে এইখানে। যুদ্ধ হবে পদার্থজগতের বিরুদ্ধে—সমস্ত নিসর্গের ঔদ্ধত্যকে পরাজিত করে বুদ্ধির দাস করে রাখতে।

এরই মধ্যে বেণেদের জুয়ো আরম্ভ হয়ে গেছে। এখানে নয়, দূর কলকাতা ও লণ্ডনের এক একটী দালালী হৌসে নিমিয়াঘাটের ভবিষ্যৎ নিয়ে ফাট্‌কা সুরু হয়ে গেছে। বেতারে খবর বিলি হয়—কাজ কতদূর এগিয়েছে। শেয়ার নিয়ে হানাহানি চলে। নতুন এক

ঘোড়দৌড়ের জুয়ার আস্বাদে নিখিল-বিশ্ব-দালালী মস্তিষ্কে নেশা জমে এসেছে।

স্ট্রাইক আরম্ভ হয়েছে। নিমিয়াঘাটের এই সুন্দর ইষ্টাপূর্ত্ত রূপ হঠাৎ বীভৎস হয়ে গেছে। সংগ্রামের সেই বুদ্ধির ঐক্য ঘুচে গেছে, দীপ্তি নিভে গেছে। এক আত্মবিচ্ছেদের বিষে শিবিরের শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। শুনলাম, কণ্ট্রাক্টর জ্যাকব এণ্ড জ্যাকবের ক'জন সাহেব অফিসার, গোটা দশেক ইঞ্জিনিয়ার আর বড় মামা ছাড়া সবাই ধর্ম্মঘট করেছে। দশদিন থেকে কাজ বন্ধ।

সেদিনের ঘটনাগুলি আজও খুব স্পষ্ট হয়ে মনে পড়ে। দশ দিন ধরে সেই ময়দানবের পুরী যেন নিঝুম হয়ে রইল। চীফ ইঞ্জিনিয়ারের বাংলোর সামনে মাঠের উপর একটা গুর্খা ফৌজ এসে ডেরা নিয়েছে। সাহেবের ফুলবাগানে রোজ একটা জটলা দেখা যায়। তার মধ্যে অফিসারেরা আছে—কয়েকজন মিস্ত্রী, টাণ্ডেল আর সর্দারও আছে। বোধ হয় মীমাংসার জন্ত একটা বৈঠক বসে সেখানে।

বড় মামার কাছে শুনতাম, স্ট্রাইক তাড়াতাড়ি না মিটলে একটা ভয়ানক ব্যাপার হবে। আরও মিলিটারী নাকি আসছে। নতুন লোক যোগাড়ের জন্য রিক্রুটারেরা বেরিয়েছে। কী বেয়াদব আর বেইমান এই মজুর মিস্ত্রি আর কেরাণীগুলি! এমন ঠেঙ্গানি দিয়ে হাত-পা ভেঙে এদের ছেড়ে দেওয়া উচিত, যাতে ভবিষ্যতে কোথাও যেন আর রোজগার করবার আশা না থাকে, এখানে তো নয়ই।

কলকাতার কয়েকটা খবরের কাগজকে বড় মামা কষে গালাগালি

দিলেন। এই স্ট্রাইকের খবরটা তারা এরই মধ্যে রটিয়ে দিয়েছে। শেয়ারগুলির উঠ্‌তি ভ্যালু এরই মধ্যে ইনডিফারেণ্ট হয়ে পড়েছে। এর পর নামতে আরম্ভ করবে। আমারও মনে হতো, এই স্ট্রাইকটা একটা বড় বেশী গোঁয়ার্ত্তুমি। সামান্য কয়েক আনা মজুরীর রেটের দাবী গ্রাহ্য হয়নি বলেই একেবারে কাজটা নষ্ট করে দিতে হবে, এ কীরকম ব্যবহার? একটু কৃতজ্ঞতা নেই? এক এক সময় ভাবতে খুবই খারাপ লাগতো, এতবড় একটা কীর্ত্তি অসমাপ্ত থেকে যাবে! এত বড় একটা উন্নতির স্কীম এইখানে জঙ্গলের মাঝখানে জল বালি আর পাথরের ওপর মরচে ধরে পড়ে থাকবে! কোনারকের মন্দির দেখেছি—একটা অসম্পূর্ণতার ব্যাথায় সেই মন্দিরের গায়ে ফাটল ধরে আছে। কিন্তু সেটা খুব বেশী দুঃখ দেয় না। কোনারকের স্থাপত্যগরিমা যৌবন পর্য্যন্ত গড়ে উঠেছিল, তার পরেই কোন এক দুর্ভাগ্যে শুধু তার রূপসজ্জা পূর্ণ করার সময়টুকু আর হয়নি। ভগ্নস্তূপও কত দেখছি; গোয়ালিয়রের প্রান্তরে উজ্জয়িনীর গর্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়ে আছে, কাঁটার ঝোপে ছেয়ে গেছে। দেখে তবু খুব বেশী দুঃখ হয় না। এক বৃদ্ধের কঙ্কালের মত মনে হয়—জীবনের সব ভোগের মুহূর্ত্ত পার হয়ে আয়ুক্রমের শেষ পরিচ্ছেদে পৌছে তার মৃত্যু হয়েছে। এমন কিছু শোকাবহ ব্যাপার নয়। কিন্তু নিমিয়াঘাট বারেজ বা লাল্‌কি নদীর বাঁধ যদি আজ নষ্ট হয়ে যায়, তবে ভবিষ্যতের কোন সার্ভেয়ার সত্যিই দুঃখে চমকে উঠবে—এক বিরাট কীর্ত্তির শিশুদেহের এই চূর্ণাস্থি দেখে। অভিশাপ দেবে অতীতের এই মূঢ়দের, যারা এই বাঁধকে অকালে হত্যা করলো—এই স্ট্রাইকওয়ালা মজুরদের।

স্ট্রাইকটা আমারও ভাল লাগছিল না। একটা তুর্বুদ্ধির চক্রান্ত বলেই মনে হতো। তারপর সত্যি করে একদিন আমিও বড় মামার মত একটা প্রতিশোধ নেবার জন্য যেন ছটফট করে উঠলাম। কারণ, যে-দৃশ্য দেখলাম, তাতে আমার মনের মধ্যে আর কোন ক্ষমার অবকাশ রইল না। হোক না মজুর আর কেরাণী, যতই গরীব হোক না কেন—ওদের বুদ্ধিতে পাপ ঢুকেছে। দেখলাম তুটো গার্ড তিলক রায়কে কাঁধে তুলে চীফ ইঞ্জিনিয়ারের বাংলোর সামনে নিয়ে এল। তিলকের গায়ের জামাকাপড় রক্তে ভিজে গেছে—মাথায় একটা পটি বাঁধা। ধর্ম্মঘটীরাই তিলককে মেরেছে। এই সর্ববিভাগীয় ধর্ম্মঘটে শুধু তিলক রায়ের কুলির দল যোগ দেয়নি। যোগ দেবে কেন? তিলক রায়ের দল খুসীই ছিল। দিন ছ'আনা হিসাবে তারা হপ্তা পায়, মেঠাই কাপড় কেনে, দৌড়ে দৌড়ে ঘন ঘন বাড়ী যায়, ছেলেমেয়েদের দেখে আসে। বাড়ী থেকে পুঁটুলি বেঁধে চিঁড়ে নিয়ে আসে। কাজ করতে করতে যখন একটু জিরিয়ে নেবার ইচ্ছা হয়, তখনি শাল পাতা ভেঙে ঠোঙা তৈরী করে নেয়। লাল্‌কি নদীর বালি খুঁড়ে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল বার করে। খেতে খেতে অদ্ভুত একটা তৃপ্তির তোয়াজে ওরা নিজেরাও যেন চিঁড়ের মত ভিজে যায়। তিলক রায়ের দল এই মজুরীর দাবীর লড়াইয়ে সামিল হয়নি। সিটি বাজবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা ঠিক নিয়ম মত কোদাল নিয়ে কাজে নেমে পড়ে।

কোম্পানীর গার্ডেরা আর একটি লোককে ধরে নিয়ে এল। একে আমরা আগে কখনো দেখিনি। ভদ্রলোকের ছেলে, বয়স চব্বিশ পঁচিশের বেশী হবে না, চোখে চশমা আছে, গায়ে খদ্দরের চাদর।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার বললেন।—তুমি কে হে জেণ্টেলম্যান? কোত্থেকে এসেছ?

যুবকটি উত্তর দিল।—আমি ডাক্তার, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আমার পেশা। এখানে আমার বহু পেসেণ্ট আছে।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার।—আমাদের এখানে বুঝি ডাক্তার নেই? তুমি এখানে ট্রেসপাস করতে এসেছ কেন?

যুবক।—আপনি চীফ জাষ্টিস্ নন যে আমার বিচার করতে আরম্ভ করেছেন। আমার যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে তবে পুলিশে খবর দিন। আদালতেই বিচার হবে, আমি ট্রেসপাস করেছি কি না।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার একটা বেত দেখিয়ে বললেন।—আপাততঃ এইটাই হলো আদালত। এখানে দাঁড়িয়ে অঙ্গীকার কর, আর কখনো আমার এলাকায় ঢুকবে না।

যুবক।—আমার রোগী দেখতে আমি আসবই।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার।—অল রাইট!

ডাক্তারকে গার্ডেরা ধরে কোথায় নিয়ে গেল বুঝলাম না। সমস্তদিন একটা আশঙ্কায় গায়ে কাঁটা দিতে লাগলো। সন্ধ্যাবেলা বড় মামাকে বললাম।—কী ব্যাপার বড় মামা?

বড় মামা।—ওই ছেলেটাই এই ষ্ট্রাইক্‌টা বাধিয়েছে।

রাত্রিবেলা একটা গণ্ডগোলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। বড় মামাকে একটা চাপরাশী ডাকতে এল। মজুরেরা ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাংলো ঘিরে ফেলেছে। ইঁট পাথর ছুঁড়ছে। থেকে থেকে সেই ক্ষিপ্ত জনতা হুঙ্কার ছাড়ছে।—ডাক্তারবাবুকো ছোড়্ দো।

বড় মামা গিয়ে চীৎকার করে জনতাকে আশ্বাস দিলেন।—ডাক্তারবাবু আমার কাছে আছে, ভাল আছে, তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে, বিশ্বাস কর।

মাঠের দিক থেকে গুর্খা ফৌজের বিউগ্‌লের শব্দ শোনা গেল। বড় মামা হাতজোড় করে জনতাকে বললেন।—ডাক্তারবাবুর জন্য আমি তোমাদের কাজে জামিন রইলাম। আমার কথা শোন, এখনি সরে পড় সব।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাংলোর ফটকটা আর কয়েকটা ফুলের টব ভেঙ্গে দিয়ে ধর্ম্মঘটি জনতা একটু মনের ঝাল মিটিয়ে সরে গেল।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত একটা মানসিক উত্তেজনায় ঘুম আসেনি। সকালবেলা উঠতে একটু দেরী হলো। একটা খবর শুনেই কিন্তু মনটা হাল্কা হয়ে গেল। ষ্ট্রাইক্ মিটে গেছে। বড় মামা সালিশী করে সব নিষ্পত্তি করে দিয়েছেন। চার আনা নয়, মজুরীর রেট দু'আনা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তারবাবু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—তিনি আর কখনো এদিকে আসবেন না। ধর্ম্মঘটি মজুরদের আর একটা দাবী স্বীকৃত হয়েছে—তিলক রায়ের কুলির দল নতুন রেটে মজুরী পেতে পারবে না। যা আগে পাচ্ছিল, তারা তাই পাবে। চীফ ইঞ্জিনিয়ার এই সর্ত্ত মেনে নিয়েছেন।

•

তিলক রায় লোকটা আর তার ভাগ্যটা চিরকালই হেঁয়ালির মত। এইখানে একটু দুঃখ রয়ে গেল। আমাদেরই ছেলেবেলার ভাট তিলক রায়। ওর মনের সঙ্গে আমাদের একটা আত্মীয়তা ছিল। তাই বড়

মামার ব্যবস্থাটা ন্যায়োচিত মনে হলো না। বড় মামা আমার আপত্তি শুনে হেসে ফেললেন।—তিলকটা একটা গবেট ; ঠিক হয়েছে।

বাঁধের কাজ জোরে এগিয়ে চলেছে। বর্ষার আগেই পিলারের কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। চীফ ইঞ্জিনিয়ার একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। শুনলাম, নতুন একটা এক্সক্যাভেটার এসেছে। বড় মামা খুব প্রসন্ন—শেয়ারের দাম চড়েছে।

কদিন পরেই তিলক রায় এসে মুখভার করে বললো।—বড়বাবু, আমাদের সবাইকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

বড় মামা।—হাঁ, আর তোমাদের দরকার নেই। নতুন মেশিন এসে গেছে, এখন ফালতু লোক ছেঁটে ফেলতে হবে।

তিলক।—আমরা তো মাত্র এই কটী দেশী কুলি। সবারই কাজ রইল, শুধু আমাদের থাকবে না কেন বড় বাবু?

বড় মামা।—ওরে বাবা, তোর মত চার হাজার গেঁয়ো কুলির কাজ করে দেবে ঐ একটা এক্সক্যাভেটার। তারপর তোদের কত রকম মরজি আছে, স্ট্রাইক করবি, ঘুমোবি, ছুটি চাইবি। কিন্তু এক্সক্যাভেটার তা করে না। তাকে বিশ্বাস করা যায়, তোদের করা যায় না। যতদিন দরকার ছিল, ততদিন ছিলি। এইবার তোদের ছুটী।

তিলক।—আমরা তো কখনো ষ্ট্রাইক করি নাই বড়বাবু।

বড় মামা।—করতে পারিস তো। হঠাৎ মতিচ্ছন্ন হতে কতক্ষণ?

তিলক রায়কে দেখতাম, সমস্ত দিন ছুটাছুটি করে বেড়ায়। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাংলোর বাইরে বটগাছটার ছায়ায় সকাল বিকেল

বসে থাকতো তিলক। বড় সাহেবের কাছে একবার ধর্ণা দেবে—এই তার উদ্দেশ্য।

আর একদিন এসে তিলক বড় মামার কাছে প্রায় কেঁদে পড়লো।—বড় বাবু, আজ আমাদের চাকৃতি আর কোদাল কেড়ে নিয়ে গেল।

বড় মামা।—মিছামিছি পড়ে আছিস্ কেন তোরা। কতবার তো তোকে বলেছি, এইবার তোদের চলে যাওয়া উচিত। যা ঘরে গিয়ে ক্ষেত খামার দেখ। একদিন তো যেতেই হতো।

তিলক।—বিনা দোষে কোম্পানী আমাদের সর্ব্বনাশ করে দিল বড় বাবু।

বড় মামা।—কি বলছিস তিলক? তোরাই তো ভবিষ্যতের রাজা। এই খালগুলি দিয়ে যখন জল ছুটতে আরম্ভ করবে, তখন তোদের জমির দাম কোথায় গিয়ে উঠবে, ভাবতে পারিস? তোদের মাটিকে কোম্পানী যে সোনা করে দিল রে মূর্খ।

তিলক মাত্র আর একদিন এসেছিল। সেদিন ধাওড়া খালি করে দেবার জন্য ওদের ওপর অর্ডার হয়েছে। জোলা কুলিরা প্রায় সবই তখনই এলাকা ছেড়ে গাঁয়ের পথে মেলা দিয়েছে। কুর্মিরা কিছু কিছু রয়ে গেছে। ধাওড়ার সামনে একটা পাকুড় গাছের তলায় একটা পাঁঠা বলি দিল কুর্মিরা। মাংস রাঁধলো, হাঁড়ি ভরে ভরে পচাই মদ কিনে আনলো। দুপুর থেকেই মাদল পিটিয়ে বিদায় উৎসবকে মাতিয়ে তুললো।

রাত্রিবেলা গার্ডদের চীৎকার দৌড়দৌড়ি আর জলস্রোতের শব্দে

আবার একটা অতিপ্রাকৃত কোন কাণ্ড ঘটেছে মনে হলো। বড় মামা বেরিয়ে গেলেন। জেগে বসে আছি। প্রায় শেষ রাত্রে বড় মামা ফিরলেন।

বড় মামা বললেন।—তিলক রায় খতম।

—কি হলো?

—বারুদ দিয়ে একটা পিলার ব্লো করে দিয়েছে তিলক। বাঁধের একটা সাইডে ভয়ানক জলের চোট এসে লাগছে। আজ সারা রাত কাজ হবে।

—তিলক কোথায়?

—মরে পড়ে আছে, একেবারে থেঁতলে গেছে।

ভাট তিলক রায়ের জীবনী এইখানে শেষ। ভারতবর্ষের ইণ্ডাষ্ট্রীয়ালিজেশন সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে, আজ এতদিন পরে তিলক রায়ের কথা প্রথমে মনে পড়ে গেল। ভাট তিলক যেন সত্যিই ইতিহাসের প্রেতের মত। যক্ষের মত অতীতের যত অভিমান পাহারা দিত। বহুরূপী হয়ে সে আমাদের বর্ত্তমানকে ব্যঙ্গ করতো। ভবিষ্যৎকে সে সইতে পারলো না। তার সংশয়টাকে শেষ পর্য্যন্ত সে চরম সত্য বলে জেনে গেল। তিলক রায় যেন আমাদের দেশের সেই প্রচণ্ড বন্ধ আত্মা, ক্যাপিটাল আর ইণ্ডাষ্ট্রির কলের মারের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়াই করে যে ফুরিয়ে গেল।

কালাগুরু

কত মহকুমা আফিসার এল আর গেল, কিন্তু মিস্টার টেনব্রুকের মত কেউ নয়। ছোট সহর সেখপুরার হৃদয় তিনি প্রায় জয় করে বসেছেন। একা উদ্যোগী হয়ে, চাঁদা তুলে আর গ্র্যাণ্ট বাগিয়ে হাসপাতালটাকে তিনিই মন্দদশা থেকে উদ্ধার করেছেন। পদগৌরবে তিনি মহীরুহ সমান, কিন্তু ব্যবহারে তৃণাদপি সুনীচ। অতি অমায়িক মিশুক প্রকৃতির লোক। আজ সন্ধ্যায় তাঁকে দেখা যায়, দর্জিপাড়ার মিলাদে অন্তরঙ্গ হয়ে মিশে আছেন; কাল সন্ধ্যায় হরিসভার প্রাঙ্গণে। জুতো জোড়া দরজার বাইরে খুলে রেখে আসতে কখন ভুল করেন না। কোন মতেই তাঁর নিষ্ঠার খুঁত ধরা যায় না।

মিস্টার জেরোম টি এল টেনব্রুক ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একটি নতুন নক্ষত্র। আর আলোটাও একেবারে নতুন ধরণের। তা'ছাড়া তিনি একজন ইণ্ডোলজিস্ট। নিউ-ইয়র্কের থ্যামসন ইনষ্টিটিউটের মুখপত্রে তাঁর গবেষণার বিবরণ নিয়মিতভাবে ছাপা হয়। তাঁর ভারতী বিদ্যার গভীরতা পশ্চিমা পণ্ডিতেরা প্রথম জানতে পারেন সেই বিখ্যাত থীসিস থেকে—ঋগ্বেদের প্যান-থীইজ্‌মে কেলটীয় চারণসঙ্গীতের প্রভাব। এই দুরূহ সিদ্ধান্তকে প্রমাণে-অনুমানে প্রতিপন্ন করতে হ'লে যে-পরিমাণ সপ্রতিভ যোগ্যতা থাকা দরকার, টেনব্রুক সাহেবের সেসবই আছে। তিনি দেবনাগরী লিপি পড়তে পারেন, বাংলা লিখতে পারেন ও হিন্দীতে বক্তৃতা দিতে পারেন। তাঁর দাদু ক্যাপ্টেন টেনব্রুক ছিলেন বিখ্যাত পরিব্রাজক

মার্ক টোয়েনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ভারতীয় কাল্‌চার সম্বন্ধে নানা নিগূঢ় তথ্য তিনি দাদুর কাছ থেকেই জানতে পেরেছিলেন। আজকাল ইণ্ডিয়াতে একটা জাতিবাদী অনুদারতার মালিন্য দেখা দিয়েছে, নইলে টেনব্রুকের প্রতিভার এই দিকটাও লোকে চোখে দেখতে পেত। জগদীশপুর থেকে বদলী হবার সময় বিদায়-সভায় বক্তৃতাক্রমে তিনি তাঁর মনের কথা অকপটে খুলে বলেছিলেন—"আমার বুঝতে ভুল হতে পারে, হয়তো 'আমার জানার মধ্যে ভুল আছে, কিন্তু ইণ্ডিয়ার আত্মাটীকে আমি একরকম চিনেছি। চিরধবল কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ার মত ভারতের সেই আত্মাটীকে আমি ভালবাসি।"

অনেকদিন আগে রাজগীরের মাঠে একটা পাথরের ধূপদান কুড়িয়ে পেয়েছিলেন টেনব্রুক। এই ধূপদানটা একটা লালচে বেলেপাথরের ফোটা পদ্মফুলের মত। স্টুডিয়োতে একটা লম্বা তেপায়া স্ট্যাণ্ডের ওপর ধূপদানটা বসানো থাকে। প্রতি সন্ধ্যায় বেয়ারা এসে ধূপদানের বুকে প্রায় আধমুঠো কালাগুরু পুড়তে দেয়। টেনব্রুক বলেন— এর মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রাচ্য সৌগন্ধ্যের যাদু লুকিয়ে আছে।

বিদ্যাপীঠের ছোট ছোট ছেলেরা ফুটবল খেলছিল। আচম্‌কা একটা হুডখোলা টুরার সড়ক ছেড়ে একেবারে সশব্দে দৌড়ে মাঠের গায়ে লাগলো। দুষ্টু ছেলের মতই উৎসাহে চঞ্চল টেনব্রুক গাড়ী থেকে এক লাফে মাঠে নেমে পড়লেন। ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে লেগে গেলেন।

খেলার মাষ্টার অনাদিবাবুর বুকে দুরু-দুরু সুরু হয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্য হুইসিল বাজানো ভুলে গেলেন। তবু বার বার ডেভিড

হেয়ারের কথা স্মরণ করে কোনমতে নিজেকে ধীরে ধীরে আশ্বস্ত করে আনলেন। আবার আগের মত খেলা জমে উঠলো।

কিন্তু করালীবাবুর ছেলেটা—ঐ বলাই হলো এক নম্বরের বেয়াড়া। বল ছেড়ে দিয়ে যেভাবে পেছন থেকে সাহেবকে লেঙ্গি মারবার চেষ্টা করছে, ঘন ঘন ফাউল হেঁকেও ওকে দুরস্ত করা যাচ্ছে না। অনাদি মাষ্টারের মনের শান্তি ক্ষণে ক্ষণে খুঁচিয়ে নষ্ট করছিল বলাই—হিতাহিত ভাবনা নেই ছেলেটার।

খেলার শেষে টেনব্রুক সাহেব কিন্তু সব ছেলেদের মধ্যে বেছে বেছে বলাইকেই পিঠ চাপড়ে বাহ্‌বা দিয়ে গেলেন। সাহেব চলে যাবার পর অনাদি মাষ্টার তবু বলাইকে আর একবার ভাল করে ধমকাতে ছাড়লেন না—ভবিষ্যতে আর কখনো এরকম গোঁয়ারের মত খেলবে না।

অনাদি মাষ্টারের মন কেন জানি ভরসা পাচ্ছিল না।

টেনব্রুক সাহেবকে লোকে আরও ভাল করে চিনতে পারলো সেইদিন—দরবার দিবসের অনুষ্ঠানে। ধন্য ধন্য পড়ে গেল। বার লাইব্রেরী ও তালুকদার সমিতির প্রত্যেকটি সভ্য, তা'ছাড়া যত কেরাণী বেনিয়া পাদরী, সকলেই টেনব্রুক সাহেবের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়ে ঘরে ফিরে গেলেন।

টেনব্রুক সাহেব তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন।—"আমি প্রত্যেকটি সরকারী কর্ম্মচারীকে এবং বিশেষ করে পুলিশকে একটি সত্য স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সেই সত্য হলো, তাঁরা যেন কখনো না মনে

করেন যে তাঁরা জনসাধারণের ভাগ্যবিধাতা। তাঁরা পাব্লিকের সেবক মাত্র। পুলিশ যেন সর্ব্বদা মনে রাখে যে তারা মস্তিষ্ক নয় —তারা দুটি হাত মাত্র। তাদের কর্ত্তব্য শুধু অর্ডার পালন করা। আজকের সুপ্রভাতে আমার মনে কেন জানি একটা আবছা আশঙ্কা থেকে থেকে উঁকি দিচ্ছে—ভারতের আকাশে অলক্ষ্যে কোথায়ও বোধ হয় এক টুক্‌রো অবাঞ্ছিত বেদনার মেঘ ঘনিয়ে উঠছে। বোধ হয় একটা পরীক্ষার দিন এগিয়ে আসছে। আমাদের এই ছোট সুখী সহরেও ঝড় দেখা দিতে পারে। সেই পরীক্ষায় পাব্লিকও গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক যেন অনর্থক তিক্ত না হয়ে ওঠে। সেইজন্য আমি আগে থেকেই সবার আগে পুলিশকে তার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এই সতর্কবাণী শুনিয়ে দিতে চাই। পুলিশ যদি আইনের মাত্রা লঙ্ঘন করে, তবে সেটাও রাজদ্রোহ বলে গণ্য করতে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হবে, তার শাস্তিও আছে।"

বক্তৃতার সময় সকলেই একটা তীব্র কৌতূহল ও ঐতিহাসিক প্রতিশোধের তৃপ্তি নিয়ে ডি-এস-পি রায়বাহাদুর জানকী প্রসাদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। পুলিশ-প্রধান জানকীপ্রসাদের মুখে কিন্তু কোন ভাববৈকল্য দেখা দেয় ন। লড়াইয়ের ঘোড়ার মত তাঁর কপালের মোটা মোটা শিরাগুলি এক অবধারিত আশ্বাসে শান্ত গর্বে দপ্ দপ্ করছিল—যেমন নির্বিকার, তেমনি শান্ত আর তেমনি স্পষ্ট।

বিদ্যাপীঠের খেলার মাঠের মতই সেখপুরার জীবন হাসিখুসীতে

চঞ্চল হয়েছিল। টেনব্রুক সাহেব রোজ না হোক্, সপ্তাহে তিনটি দিন অন্ততঃ খেলতে আসেন। অনাদি মাষ্টার একটা আশঙ্কা থেকে রেহাই পেয়েছেন। বলাই আর টেনব্রুক সাহেব একই সাইডে খেলে। দু'জনের মধ্যে আর সংঘর্ষের কোন অবকাশ নেই। ছেলেগুলি সত্যি সত্যি খেলার ব্যাপারে যেন টেনব্রুকের ন্যাওটো হয়ে উঠছিল। প্রতি বৈকালে ওরা সাগ্রহ প্রতীক্ষায় সাহেবের গাড়ীর শব্দের জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

তবু মেঘ দেখা দিল। সেখপুরা সহরকে সত্যিই যেন একটা ঝড়ের আবেগ চারদিকে থেকে ঘিরে ধরেছে। লোকাল বোর্ডের একুশ জন্য সদস্য ইস্তফা দিল। তিনটে দিন হরতাল হলো। রাজগঞ্জ কোলিয়ারিতে সুরু হলো ধর্ম্মঘট। জৈন ধর্ম্মশালার আঙ্গিনায় একটা জনসভাও হয়ে গেল। একটা হাজার-মানুষের শোভাযাত্রা স্বরাজ পতাকা নিয়ে সহর প্রদক্ষিণ করে গেল।

মিষ্টার টেনব্রুক অবিচল ছিলেন। একটিও লোক গ্রেপ্তার হলো না, একশো চুয়াল্লিশ জারি করে কোন ঢোলের শব্দ বাজলো না। পুলিশ শুধু সেজেগুজে কোতোয়ালীতে বসে থাকে। বাইরে যাবার কোন প্রয়োজন হয় না—টেনব্রুকের কড়া নির্দ্দেশ।

সূর্য্যকুণ্ডের জলের মত সেখপুরা যেন তিনটি মাস ধরে উত্তেজনায় ফুটতে লাগলো। তার মধ্যে মিষ্টার টেনব্রুক শুধু একটি কাজ করলেন; দিকে দিকে ইস্তাহার ছড়িয়ে দিলেন—"আমার প্রিয় সেখপুরার পাব্লিকের কাছে এই আবেদন করতে চাই যে, যেকোন বিবাদ বা প্রতিবাদ হোক্—আলোচনা করে তার নিষ্পত্তি হওয়া

বাঞ্ছনীয়। সভ্যতার চরম উন্নতি হলো ডেমোক্রেসী, ডেমোক্রেসীর প্রাণ হলো ডিসিপ্লিন। সেই ডিসিপ্লিন যেন নষ্ট না হয়।"

ঘটনাগুলি যেন নিজের উত্তেজনাতে অবসন্ন হয়ে ক্রমে থিতিয়ে এল। কোথাও প্রতিহত হলো না বলেই বোধ হয় ফুরিয়ে গেল। টেনব্রুক তাঁর নৈতিক এক্সপেরিমেণ্টের এই অভাবিত সাফল্যে খুসীতে বিভোর হয়ে রইলেন। সহরের নানা সম্প্রদায়ের দশজন বেসরকারী এবং পাঁচজন সরকারী প্রধানকে ডেকে নিয়ে শান্তি কমিটি গঠন করলেন। কে যেন পরামর্শ দিল, ডি-এস-পি'কে কমিটির মধ্যে গ্রহণ করা হোক্। শুদ্ধাদর্শী টেনব্রুক শুচিবাতিকের মত নাক কুঁচকে আপত্তি জানালেন—না, কোনমতেই নয়।

শুধু থামছে না প্রভাত ফেরীর গান। ঝড়টা যেন পালিয়ে গেছে শুধু ভৈরবী সুরের একটা আক্রোশ রেখে দিয়ে। সেখপুরার নিথর সুপ্তির মধ্যে প্রতিদিন শেষ রাত্রে কারা যেন পথে পথে গান গেয়ে চলে যায়। টেনব্রুক দিন গুনছিলেন, এই চৌরচপলতাও ক্রমে শান্ত হয়ে আসবে।

অনেকদিন গোনা হয়ে গেল। টেনব্রুক তবু ধৈর্য্যে ও বিশ্বাসে অটল ছিলেন। শান্তি কমিটি কত গোপন খবর এনে দিল, তবু প্রভাতফেরীর রহস্যটা আজও ঘুচলো না। কেউ বলতে পারে না, কারা গান গায়, কোথা থেকে আসে এবং কোথায় চলে যায়? মাঝ রাত্রে সহরের সব পাড়ার কত ছেলেবুড়ো উঠে বসে থাকে। প্রতীক্ষায় নিঝুম মুহূর্ত্তগুলি পার হতে থাকে। হতাশ হয়ে ভাবে—আজ বুঝি

আর গানটা এল না। সেই আন্‌মনা অবকাশের মধ্যে চকিতে বাইরের পথে গানের শব্দ উতরোল হয়ে ওঠে। দরজা খুলে বাইরে আসতে আসতেই মিলিয়ে যায়—কাউকে দেখা যায় না।

এ গান কখনও বন্ধ হবে না। সহরে একটা কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে।—এই গয়ারোড ধরে যদি মাইল খানেক পশ্চিমে এগিয়ে যাও, তবে প্রথমে পড়বে ডুমরিচকের ডাকবাংলা। সেখান থেকে ডাইনে বেঁকে আরও পাঁচ ক্রোশ। পুরণো কারবালা পার হয়ে একটা বহেড়ার জঙ্গল, তার উত্তর ঘেঁসে একটা নদী। নদীর এক পাশে একটা প্রকাণ্ড পিপুল গাছ হেলে আছে। অন্য পাশে পি-ডব্ল্যু-ডির সড়ক।

—হাঁ আছে। সবাই জানে, সার্ভিস বাসগুলি গিরিডির পথে মোড় ফেরবার আগে এইখানে একটু জিরিয়ে নেয়—রেডিয়েটারে নতুন জল ঢালে। একটা চৌকীদারী ফাঁড়ি আছে সেখানে। পিপুলতলার একটা গাঁথুনির ওপর দ্রাঘিমার নম্বর লেখা আছে।

শোকাবহ বেদনায় কাহিনীটা আরো করুণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।—সেই সন সাতান্নের গদরে ঠিক ঐ জায়গাটীতে একশো জন ছত্রী সেপাইয়ের প্রাণ গিয়েছিল। এক কার্ণাইল সাহেব ঐ পিপুলতলায় তোপ বসিয়ে বন্দী ছত্রীদের উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে কাহিনীটা সবার কানে কানে চুপি চুপি ফিস্‌ফিস করে যায়।—গানটা সত্যিই কোন মানুষের গলার গান নয়—প্রভাতফেরীটেরী নয়। একটা শব্দমরীচিকা মাত্র। গয়ারোডের দিক থেকেই শব্দটা প্রথমে শোনা যায়। সারারাত ধরে এগিয়ে আসে, তারপর সহরে ঢোকে এবং ভোর হতে না হতেই সরে পড়ে।

মিষ্টার টেনব্রুকও কাহিনীটাকে শুনলেন। বিভ্রান্ত ও সন্ত্রস্ত শান্তি কমিটিকে তিনিই আশ্বাস দিয়ে জানালেন—ঘাবড়াবার কিছু নেই। এইসব প্রেতরাগিণী আর কিম্বদন্তীর সঙ্গে লড়বার কায়দাও আমি জানি।

অগ্রাণের রাত্রি ভোর হয়ে আসে। মোড়ের মাথায় মিউনিসিপাল ল্যাম্পপোষ্টের মাথাটা তখনো জ্বলছে। শিশির-ভেজা সড়কটা নেতিয়ে পড়ে আছে অলসভাবে। শালের ডালপালাগুলি এক একটা কুয়াসার স্তবক আঁকড়ে নিঝুম হয়ে আছে। সেই ফিকে অন্ধকার আর মূক নিসর্গের মাঝখানে কাছারী রোডের ধারে একটি গাছতলায় মিষ্টার টেনব্রুক যেন গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—এক অবাস্তব দেশের সেনাবারিকে সতর্ক শান্ত্রীর মত।

এতক্ষণে শুনতে পাওয়া গেল। মন্থর বাতাসের গায়ে দূরাগত সেই অদ্ভুত সুরের শিহর এসে লাগছে। গানের ভাষা স্পষ্ট কিছু বোঝা যায় না। ছোট ছোট শব্দময় স্রোত একসঙ্গে মিশে গিয়ে যেন এক সুরপ্রপাত সৃষ্টি করেছে। তারা এগিয়ে আসছে।

—নয়া জমানার সূর্য্য উঠেছে। জাগো আমার হিন্দুস্থানী ভাই আর বহিন। জেগে উঠে এই নতুন রশ্মি সাগ্রহে পান কর।

গাইতে গাইতে প্রভাতফেরীর দলটা সামনে এসে পড়লো। ছোট ছোট কতগুলি গীতপ্রাণ অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি। চেনবার জো নেই। মিষ্টার টেনব্রুক স্তব্ধ হয়ে নিশ্বাস রুখে শুনছিলেন। কতগুলি কচি কিশোর মানুষের মিলিত কণ্ঠস্বর—তার হর্ষ উল্লাস আক্ষেপের প্রত্যেকটি

ধ্বনি তাঁর অতি পরিচিত। টেনব্রুকের চোয়াল দু'টো রুদ্ধ উত্তেজনায় নিঃশব্দে কঠিন হয়ে উঠতে লাগলো।

আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলেন টেনব্রুক। পরিশ্রান্ত গানের সুরটা যেন এপাড়া-ওপাড়া ছুঁয়ে এলোপাথাড়ি দৌড়ে চলে যাচ্ছে। মাঠের কাছাকাছি গিয়ে গানটা আর একবার বিজয় প্রণাদের মত উদ্দাম হয়ে উঠলো। তারপরেই আকস্মিক একটা বিরাম। কিছুই শোনা যায় না। অনেকক্ষণ পরে আবার গুম্‌রে উঠলো—একেবারে অন্যদিকে। বোধ হয় পশ্চিমের ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে রেললাইন ডিঙিয়ে দর্জিপাড়ার দিকে ছুটে চলেছে। চটুল ঘূর্ণি বাতাসের মত গানটা যেন উড়ে যাচ্ছে।

গল্প আছে, আওরঙজেব অক্ষয় বটের শেকড় তুলে ফেলে তাতে গরম সীসা ঢেলে দিয়েছিলেন যেন ভবিষ্যতে কোন দিন আর চারা গজিয়ে না ওঠে। একেই বোধ হয় আমূল চিকিৎসা বলে।

টেনব্রুক বোধ হয় গল্পটা জানতেন। বিকালে বিদ্যাপীঠের ছুটির পর ছাত্রেরা কেউ বাড়ী যেতে পারেনি। স্বয়ং টেনব্রুক উপস্থিত থেকে ছাত্রদের একটা শোভাযাত্রা রওনা করিয়ে দিলেন। রাত দশটা পর্য্যন্ত সহরের সর্ব্বত্র এই শোভাযাত্রা ঘুরবে। ফিরে বিদ্যাপীঠে এসেই শেষ হবে। তারপর খাওয়া দাওয়া হবে। টেনব্রুক জিলিপি কেনবার জন্য দশটি টাকা দিলেন।

প্রায় একশো ছাত্রের পুরোভাগে অগ্রনায়কের মত একটু এগিয়ে দাঁড়িয়েছিল বলাই। তাকেই শোভাযাত্রা চালিয়ে আর গাইয়ে নিয়ে যাবার ভার দেওয়া হয়েছে। টেনব্রুক সাহেবের নির্দ্দেশ।

বলাইয়ের মাথাটা সামনের দিকে ভাঙা গাছের ডালের মত ঝুঁকেছিল। মাটীর দিকে একটা উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি নিয়ে দেখছিল বলাই। ওর সমস্ত দুরন্তপনা এক চরম অপমানের আঘাতে যেন অসাড় হয়ে গেছে। আসন্ন মূর্চ্ছার সময় রোগীকে যেন জোর করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।

গানটা টেনব্রুকের রচনা। নামতা পড়াবার ভঙ্গীতে বলাই সুর করে গানের প্রথম পদটি গাইলো।—আমি যীশুর ছোট মেষ!

শোভাযাত্রী ছেলেরা বিষণ্ণ পাখির ঝাঁকের মত কিচির মিচির করে ধুয়া ধরে গাইলো।—আমি যীশুর ছোট মেষ।

যেন জিভে কামড় পড়েছে, বলাই হঠাৎ আরও জোরে বিকৃত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো।—প্রতিদিন মোর সুখ অশেষ—

ছেলের দল প্রতিধ্বনি করলো।—প্রতিদিন মোর সুখ অশেষ।

শোভাযাত্রা রওনা হলো। হিতৈষী অভিভাবকের মত মনের স্নেহ মনেই গোপন রেখে, শাসনের দোর্দণ্ড বিগ্রহের ভঙ্গীতে যেন টেনব্রুক কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেখলেন, বাংলোয় চলে গেলেন। তিনি জানতেন, রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত এইভাবে সুপথে চলে চলে ছেলেগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়বে— বিপথে যাবার উৎসাহও নিভে যাবে। তা'ছাড়া দশটাকার ঘুমপাড়ানী মিষ্টির ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। আর ভাবনা নেই। টেনব্রুক নিশ্চিন্ত হলেন।

সন্ধ্যে হয়েছে। ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারখানা টেবিলের ওপর রাখা ছিল। ইণ্ডোলজিস্ট টেনব্রুক আজ সেখপুরার প্রত্নরহস্যের বুক চিরে

খানাতল্লাসী করবেন। ঐ প্রতিহিংসাপরায়ণ কিম্বদন্তীটা ভয়াবহ ব্যাধির মত সারা সেখপুরার নাগরিক বুদ্ধি বিষাক্ত করে তুলেছে। এর পেছনে কোন সত্যের ভিত্তি আছে কি ?

গেজেটীয়ার হাতড়ে হাতড়ে টেনব্রুক এক জায়গায় এসে বিস্ময়ে চমকে উঠলেন। সত্যিই যে লেখা আছে ছাপার অক্ষরে—ডুমরিচকের ডাকবাংলো থেকে এগার মাইল দূরে যে পিপুল গাছের তলায় স্থানীয় দ্রাঘিমারেখার পরিচয় লেখা আছে, সেখানে একদিন কোম্পানীর ফৌজের কামানের বেদী ছিল। স্থানীয় লোকেরা বলে, মিউটিনির সময় ঐখানে সেপাই বন্দীদের প্রাণদণ্ড হয়েছিল।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কোন্ গবেট সার্ভেয়ার এই ষাঁড়-মোরগ গল্পটি সরকারী গ্রন্থের পাতায় ফেঁদে গেছেন! মিষ্টার টেনব্রুক মনে মনে সেই মূঢ় পণ্ডিতের বুদ্ধিকে লিঞ্চ করলেন। ধিক্কার দিলেন—এইসব রন্ধ্র দিয়েই একদিন শনি ঢোকে এবং হোয়েছেও তাই। জন কোম্পানীর বেণেবুদ্ধি দিয়ে বিংশ শতাব্দীর কলোনি শাসন চলে না। চাই আমূল চিকিৎসা। ইণ্ডোলজিস্ট টেনব্রুক তাঁর প্রতিভার ছুরিকে দু'ঘণ্টা ভেবে ভেবে শানিয়ে নিলেন।

নতুন করে প্যারা লিখলেন টেনব্রুক।—'ডুমরিচক ডাকবাংলা থেকে এগার মাইল দূরে, নদীর ধারে, পিপুলগাছের তলায় যেখানে দ্রাঘিমারেখার পরিচয় লেখা রয়েছে, সেখানে (প্রথম পৌরাণিক যুগে—খৃষ্ট মৃত্যুর পরে পঞ্চম শতকে) ব্রহ্মদত্ত নামে এক ঋষির আশ্রম ছিল……।

হঠাৎ একবার কলম থামালেন টেনব্রুক। ভাবতে ভাবতে ভুরু

ছুটো কেঁচোর মত পাকিয়ে উঠলো। কদর্য্য একটা কুহক যেন ছোট ছায়ামূর্ত্তি ধরে তাঁর দৃষ্টিপথ জুড়ে নেচে বেড়াচ্ছে। এই মূর্ত্তিটাকে চিনতে পারা যায়—গান্ধী গান্ধী গান্ধী। সবাই তাকে বলে গান্ধী। কে এই গান্ধী? এই অশান্ত অবাধ্য দুষ্টু ফকীর গান্ধী? কী ভেবেছে সে?

দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত করে কলমটা আবার তুলে ধরলেন টেনব্রুক। যেন একটা প্রেরণার আবেশে লিখে ফেললেন।—'এক দুর্দান্ত পাপী কিরাতের দৌরাত্ম্যে রাজ্যের সুখ ও শান্তি নষ্ট হতে বসেছিল। ক্ষত্রিয় রাজা দেবপ্রিয়ের সেবায় ও প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে ঋষি ব্রহ্মদত্ত সেই কিরাতকে অভিশাপ দিয়ে ভস্ম করে ফেলেন।'

টাইপ রাইটার মেসিনটাকে সাগ্রহে বুকের কাছে টেনে নিলেন টেনব্রুক। নতুন একটী কাগজের স্লিপের ওপর এই ঐতিহাসিক সত্যটিকে টাইপ করে সাজালেন। পুরণো প্যারাগ্রাফের ওপর খাপে খাপে মিলিয়ে আঠা দিয়ে সেঁটে দিলেন। চেপে চেপে বসিয়ে দিলেন, চার পাশ থেকে দেখলেন, যেন কোথাও কোন ফাঁক না থাকে।

এই সামান্য কাজটুকু করতেই হাঁপিয়ে উঠেছিলেন টেনব্রুক। ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন। একটা বাচাল ঝর্ণার মুখে যেন পাথর চাপা দিচ্ছেন। আশ্বস্ত হলেন, আর কোন ফাঁক নেই।

বাকী রইল আজকের রাতটা। তখন সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে। এক পেয়ালা কফি খেয়ে পরিশ্রান্ত টেনব্রুক ঘরের ভেতর কিছুক্ষণ পাইচারী করে নিলেন। তারপর ল্যাম্পের ওপর নীলকাঁচের ঘেরাটোপ

টেনে দিয়ে পড়তে বসলেন। সার্থক আনন্দের আরামে সোফার ওপর শরীর এলিয়ে দিলেন।

বাইরের শব্দহীন অন্ধকারটা তখন জমাট বেঁধে গেছে—একটা শোকাচ্ছন্ন রাত্রির হৃদ্‌পিণ্ডের মত। আমবাগানের ভেতর দিয়ে ছাত্রদের শোভাযাত্রা ফিরছে এতক্ষণে। একশত ক্লান্ত ভাঙা-গলার একটা বিকৃত গানের শব্দ আসছে। ঠিক শব্দ নয়—শব্দের রুষ্ট নিঃশ্বাস। একটা আহত সর্পযূথ যেন বিষদাঁত নতুন করে ঘসে নেবার জন্য আড়াল দিয়ে সরে পড়ছে।

হঠাৎ শিউরে উঠলেন টেনব্রুক। ভারতের আত্মার ছবিটা টেনব্রুকের মনের ভেতর হঠাৎ ঘোলা হয়ে গেল—কাঞ্চনজঙ্ঘার চিরধবল চূড়ার মত নয়, বলাইয়ের মুখটার মত বর্ণচোরা হিংসুক ও ভীরু।

টেনব্রুক খোলা জানালাটার দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মত কিছুক্ষণ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন। একটা নিষ্ঠুর নৈরাশ্য চিন্তার শিরায় শিরায় শিউরে উঠতে লাগলো।—না, ওরা মানবে না। আবার ওরা আসবে। আজই রাত্রিশেষে—those singing ghouls—সেই বায়ুভূত নিরালম্ব ছোট ছোট মসীমূর্তি—সয়তানী আনন্দে অপমৃত্যুর কোরাস গাইতে গাইতে আবার আসবে—দল বেঁধে—কাতারে কাতারে।

রাজগীরের ধূপদানের বুকটা তখন প্রবলভাবে পুড়ে চলেছে। কুণ্ডলী কুণ্ডলী ধোঁয়া জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে অবলীল স্বাচ্ছন্দ্যে বাইরে উড়ে যাচ্ছে। টেনব্রুকের মাথার ভেতর একটা বোবা বিভীষিকা ছটফট করতে লাগলো।

অসহ উদ্বেগে টেনব্রুক টেবিলের ওপর ঘন্টি ঠুকতে লাগলেন। বেয়ারাটা তন্দ্রা ছেড়ে ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে এসে ডাকলো—হুজুর।

টেনব্রুকের সারা মুখে একটা রক্তাভ জ্বালার দীপ্তি। মাত্রা ছাড়িয়ে অস্বাভাবিক রকম স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—জলদি দৌড়ে যাও, ডি-এস-পি সাহেবকে সেলাম দাও। সুবেদার মেজরকে বোলাও। জলদি কর। আজ রাত্রে ইষ্টার্ণ রাইফেলস্ ঘুমোতে পারবে না। সহরটাকে কর্ডন দিয়ে রাখ। সমস্ত রাত পাহারা দিতে হবে। শিকারীর মত তাড়া করে আজ ওদের ধরে ফেলতে হবে। চরম শিক্ষা শিখিয়ে দিতে হবে আজ।

ডেমোক্রেসীর এই সঙ্কটের শেষ ঘটনা হলো সম্রাট বনাম বলাইয়ের মোকদ্দমা। তার বিবরণ জানবার উপায় নেই। কে ঢুকবে আদালত এলাকায়? যে-ভয়ানক লাঠি আর লালপাগড়ীর আস্ফালন! বন্দীবাহী মোটর লরিটা থেকে নামবার সময় দূর থেকে বলাইকে চকিতে একটুখানি দেখতে পাওয়া যায়—মাথায় ব্যাণ্ডেজ, কোমরে দড়ি, হাতে হাতকড়া। ডি-এস-পি জানকী প্রসাদের মূর্ত্তিটাই সব চেয়ে স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে—আদালতের উঁচু বারান্দার ওপর টান হয়ে দাঁড়িয়ে বেল্টের ওপর হাত বোলান, কপালের ওপর মোটা মোটা শিরাগুলি অশান্ত গর্বে দপ্ দপ্ করে ফুলে ওঠে, আর ফটকের বাইরে ভীড়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ গর্জন করে ওঠেন—ডিসপার্স।

তারপরেই ফটকের পুলিশ পিকেটের দিকে তাকিয়ে থাবা তুলে অর্ডার হাঁকেন—চার্জ!